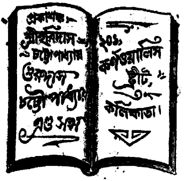
আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার উনত্রিংশ গ্রন্থ

নীলমাণিক

রায়সাহেব
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন কবিশেখর
বি এ,

ভাদ্র,—১৩২৫



প্রিণ্টার—শ্রীরাধাশ্যাম দাস,
ভিক্টোরিয়া প্রেস,
২ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

1051

উপহার

প্রিয়বর শ্রীযুক্ত জে, ডি, এণ্ডারসন,

অবসর-প্রাপ্ত আই, সি, এস,

এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষার

অধ্যাপক মহাশয়

প্রিয়বরেষু—

আপনি আমাকে বাঙ্গলা ভাষায় অনেক পত্র লিখিয়াছেন—সেগুলি পাঠ করিয়া বুঝিয়াছি আপনার বাঙ্গলা ভাষায় জ্ঞান বাঙ্গালীদের মতই। সপ্তম বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত আপনি ইংরাজি জানিতেন না, বাঙ্গলা ভাষাতেই কথাবার্ত্তা কহিতেন, সুতরাং বাঙ্গলা একরূপ আপনার মাতৃ-ভাষা। এই ভাষার সেবকগণের প্রতি আপনার অনুরাগ অকৃত্রিম। ভারতবর্ষের প্রচলিত ভাষাগুলির তুলনা-মূলক ব্যাকরণ-বিচারে আপনার কৃতিত্ব অসাধারণ, এ বিষয়ে আমরা কেহই আপনার

সমকক্ষ নহি; সুবিখ্যাত ভাষাবিৎ স্যার জর্জ্জ, গ্রীয়ার
মহোদয়কে বাদ দিলে এ ক্ষেত্রে বোধ হয় আপ
সঙ্গে তুলনার যোগ্য দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। বা
ভাষায় আপনার অনন্য-সাধারণ ব্যুৎপত্তির প্রতি শ্রদ্ধ
নিদর্শন-স্বরূপ আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আপনা
উৎসর্গ করিতেছি। আপনি আমাকে কনিষ্ঠের ন্যায় ভ
বাসিয়া থাকেন, আশা করি, এই ক্ষুদ্র উপহার সস্নেহে গ্রহ
পূর্ব্বক আমাকে অনুগৃহীত করিবেন।

ভবদীয়

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

ভূমিকা

এই পল্লীচিত্রে আমাদের সমাজের নিম্নস্তরের দৃশ্য আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছি। আধুনিক গল্পগুলিতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিযুক্ত উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণই সাধারণতঃ নায়করূপে মনোনীত হন, নীলমাণিক ইংরেজী বিদ্যালয়ে সবে প্রবেশ করিয়াই সে পথ ত্যাগ করে—সুতরাং এই আখ্যায়িকায় পাড়াগেঁয়ে ভাব ও রুচির প্রভাব একটু বেশী আছে, তাহা সব সময়ে সুখদ ও নির্ম্মল হইয়াছে কি না, পাঠকগণই বিচার করিবেন। যে শিক্ষাকে আধুনিক কালে আমরা সভ্যতার চরম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তাহা বাদ দিলেও যে আমাদের শ্রেয় পথের কোন বিঘ্ন হয় না, এই গল্পে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি; কতদূর সফল হইয়াছি তাহার বিচারক আমি নহি।

বেহালা (২৪শ পরগণা)
২২শে জুলাই ১৯১৮

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

নীলমাণিক

১

সকলের সঙ্গে সে যখন খেলা করিতে যাইত, তখন কেহ তাহাকে 'আদুরে', কেহ 'অকর্ম্মা' বা 'বোকা' বলিয়া গালি দিত ; সে ব্যাট্‌-বল খেলিতে গেলে ব্যাট্‌টা ঠিক সোজা করিয়া ধরিতে পারিত না ; কষিয়া মারিতে যাইয়া নিজের পায়ে অথবা 'উইকেটে' ঘা' দিত। হাতের কাছের বল্‌টা ধরিতে পারিত না, বরং হোঁছট্‌ খাইয়া পড়িয়া যাইত। তাস্‌ খেলিতে যাইয়া টেক্কাটা হাতে থাকিতে কি ভাবিয়া সে তুরুপ করিয়া বসিত ; সাহেবটি থাকিতে দওলাটা বিদায় করিয়া অপর পক্ষের হাতে পিঠ্‌টি ছাড়িয়া

দিত। তাহার খেড় রাগিয়া তখন তাহার গালে ঠাস্ করিয়া চড় মারিত ; চড় খাইয়া সে চক্ষের জল বহু চেষ্টায় সাম্‌লাইয়া লইত,—কারণ, কাঁদিতে দেখিলে ছেলেরা বলিবে, "আদুরে ছেলে, ঘরে যাও, এখানে তোমার মত গরুকে চরাইবে কে ?"

শুধু ইহাই নহে,—অনেক সময়ে ছেলেরা তাহাকে লইয়া নিষ্ঠুরভাবে আমোদ করিত। "নীলমাণিক, তুই কতক্ষণ এখানে এক পায়ে দাঁড়া'য়ে থাক্‌তে পারিস্ ?" কোন একটা কার্য্যে যোগ্যতা দেখাইতে সে এত ইচ্ছুক ছিল, যে সে বলিয়া উঠিত, "আধ ঘণ্টা"। "সাবাস্, তাই দাঁড়া দেখি।" এই বলিয়া কোন দুষ্ট ছেলে নিকটবর্ত্তী আম্রবৃক্ষের মৌচাকে ঢিল মারিয়া পলাইয়া যাইত। নীলমাণিক একদিন এই ভাবে দাঁড়াইয়া বহু মক্ষিকার দংশন জ্বালা সহ্য করিয়াছিল, এবং তাহার গাল ও পিঠ ফুলিয়া তাড়সে জ্বর হইয়াছিল।

নীলমাণিক সন্ধ্যাকালে তাহার দিদির কাছে বসিয়া

'মানভঞ্জন', 'মুক্তালতাবলী' এবং 'রামায়ণ' পাঠ শুনিত। ইহারা গৃহস্থ-বৈষ্ণব ছিল, প্রায় প্রতিদিনই বাড়ীতে মহোৎসব বা কীর্ত্তন হইত। যখন নীলমণিকের বয়স সাত, তখন সে 'রামায়ণ' প্রায় সমস্তটা মুখস্থ বলিতে পারিত; বৈষ্ণব পদ ও নরোত্তম দাসের প্রার্থনা সে নিজের মনে একা বসিয়া আবৃত্তি করিত। বিদ্যালয়ে সে খ্যাতি লাভ করিতে পারে নাই; কিন্তু চিন্তা দিদি গানের সুরে যে সকল পুস্তক পড়িত, তাহা তাহার কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত।

ঢাকাজেলার নারা(য়)ণপুর গ্রামে তাহাদের বাড়ী ছিল—ভদ্রাসনটি ছিল দশবিঘা জুড়িয়া। অনেক আম ও সুপারি গাছ বাড়ীর চারিদিকটা ঘিরিয়া ছিল; সেগুলি তাহার পিতা ভগবান্ অধিকারী নিজ হস্তে রোপণ করিয়াছিল। প্রাতঃকালে সেই বাগান-বাড়ীর দীর্ঘ দেবদারু ও সুপারি গাছের আড়াল হইতে সূর্য্য উঁকি মারিত,—তখন গলিত সোনার ধারায় যেন নীলাভ-

কৃষ্ণ পত্র সকল ঝল্‌সিয়া যাইত—মনে হইত যেন, প্রকৃতি স্বর্ণ-গঙ্গায় স্নান করিয়া উঠিয়াছেন। সন্ধ্যায় চতুর্দ্দিকের সমস্ত পক্ষী,—কোনটি নীলবর্ণ, কোনটি হরিদ্বর্ণ, কোনটির গায়ে ইন্দ্রধনুর রং, কোনটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ—কলরব করিয়া সেই বাগান-বাটীর নিবিড় তরুচ্ছায়ায় আশ্রয় লইত। নীলমাণিক বসিয়া বসিয়া আগন্তুক পক্ষী সকল ও আকাশের তারা গণিতে থাকিত; এক, দুই, তিন করিয়া জোরে জোরে গণিত—কখনও সাতাইশের পর তেইশ গণিয়া তাহার অদ্ভুত গণিত-জ্ঞানের পরিচয় দিত। তখন সাথীরা 'মুখ্‌খু' ও 'খ্যাপা' বলিয়া ঠাট্টা করিয়া উৎসাহ দেওয়ার জন্য তাহার পিঠ চাপড়াইতে থাকিত।

তাহাদের বাড়ীর পূর্ব্বদিকে একটি পুকুর ছিল, তাহার জল ছিল কাক-চক্ষুর ন্যায় নির্ম্মল কৃষ্ণবর্ণ। সেই পুকুরের ধারে ধারে তাল, আম্‌ড়া ও আমগাছের সা'র ছিল। বর্ষাকালে সূর্য্যাস্তের সময় সেই পুকুরের জলে চারিদিকের ঘাসের রং ফলিয়া একটা মনোরম সবুজের

আভা বিস্তার করিত ; যেন গাছগুলি সবুজ রঙের কৌটা খুলিয়া সেই রং গায়ে মাখাইয়া থাকিত। চক্ষু দুটি সেই শীতল সবুজ-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া জুড়াইয়া যাইত। নীলমাণিক সেই পুকুরের পাড়ে শ্যামাভ স্নিগ্ধ বর্ণের বহর দেখিয়া রামায়ণের "কপটে মনুষ্যদেহ দূর্ব্বা-দলশ্যাম''—পয়ারার্দ্ধ আওড়াইতে থাকিত ; কখনও পুকুরের ঊর্দ্ধে নীলাকাশের প্রতি বিস্মিত চক্ষে চাহিয়া "আকুল নয়নে চাহে মেঘপানে, না চলে নয়নের তারা" পদটি মৃদুস্বরে গান করিত।

শেষরাত্রি হইতে কত 'বউ কথা কও', 'চোখ গেল' ও 'খোকা হোক' প্রভৃতি পাখী সেই বাগানে প্রভাতী গাহিয়া নীলমাণিকের ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিত। নীলমাণিক ঘুম হইতে উঠিয়া গাছের তলায় তলায় ঘুরিত এবং সেই সকল পাখীর স্বর অনুসরণ করিয়া চীৎকার করিত ও তাহাদের ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া লাফাইয়া ছুটিত।

কখনও বাড়ীতে কীর্ত্তন হইত। কীর্ত্তনিয়া দুই হাতের অপূর্ব্ব ভঙ্গী করিয়া গাইত,—"নারী-জনমে হাম না করিলুঁ ভাগি। এখন মরণ শরণ ভেল মান কি লাগি।" নীলমাণিক উহার অর্থ বুঝিত না, কিন্তু সেই সুর কোকিল ও পাপিয়ার সুরের মতই তাহার নিকট মিষ্ট বোধ হইত। কয়েক দিন পর্য্যন্ত সে দিনরাত কেবল মৃদুস্বরে নিজে নিজে গাহিত—"নারী-জনমে হাম না করিলুঁ ভাগি। এখন মরণ শরণ ভেল মান কি লাগি।"

চারিদিকের নিত্যশ্রুত বৈষ্ণব কবিতা, দোলের আবির, কীর্ত্তনের খঞ্জনীর শব্দ, পাখীর গান—চারিদিকে স্নিগ্ধ সবুজ বর্ণের খেলা, তার উপর সূর্য্যের সোহাগ-মাখা সোনার হাসি তাহাকে যেন নিত্য স্বপ্নরাজ্যের তাজমহলে বাস করাইত।

২

বহু ছেলে-মেয়ে মরিয়া যাওয়ার পর যখন অন্নপূর্ণার সন্তান হওয়ার আর কোনই সম্ভাবনা ছিল না, তখন সহসা সেই আঁধার ঘর আলো করিতে নীলমাণিকের উদয় হইল। তাহার পিতা যখন শুনিল যে তাহার একটি পুত্র জন্মিয়াছে, তখন সে স্নান করিতেছিল: তাহার ভিজা কাপড়খানি ও পরিবার শুকনো কাপড়, একটা গাড়ু ও তৈলের বাটি, একটা জলের ঘড়া যাহা সাম্‌নে ছিল, তাহার সমস্তই সে গরীব-দুঃখীকে ডাকিয়া দিল ও নিজে ভিজা গাম্‌ছাখানি পরিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে ঘরে গেল। সেই দিন সন্ধ্যাকালে অধিকারীর বাড়ীতে খোল-করতাল বাজিয়া উঠিল! ভগবান্ অধিকারীর স্বর সে দিন অশ্রুসিক্ত—সকরুণ। সে দিনকার কীর্ত্তনের গানটি ছিল—"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর—চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।"

সেই দিন হইতে কত আদর ও সোহাগে নীলমাণিক বড় হইতে লাগিল। কত 'রক্ষা-কবচ' ও মাদুলি তাহার বুকে ঝুলিল। তাহার কোন একটু অসুখ হইলে মল্লিকপীর সিন্নি পাইতেন, বাড়ীর "রাধাবল্লভ" ভোগ পাইতেন, অদ্বৈতবংশ শ্রীধর গোঁসাই স্বস্ত্যয়ন করিতে বসিয়া যাইতেন। গ্রামে রটিয়া গেল, নীলমাণিক আদুরে ছেলে; এই খোঁটা দিয়া তাহার সঙ্গীরা তাহাকে জ্বালাতন করিয়া মারিত। তাহার মত বোকা ছেলে সে গ্রামে আর ছিল না। কোন শিশুর পয়সার দরকার হইলে সে নীলমাণিককে যাইয়া ধরিত; নীলমাণিক তাহার মাকে ধরিয়া তাহা আদায় করিয়া খেলার সাথীকে দিত; বন্ধুটি সেই পয়সা লইয়া শুধু কৌতুক করিবার অভিপ্রায়ে হাতের কঞ্চিটা দিয়া নীলমাণিকের পিঠে একটা বাড়ি মারিয়া পলাইয়া যাইত। নীলমাণিক ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিত; তাহার বড় দু'টি চক্ষের কোণে যে অশ্রু আসিত, তাহা সে বামহস্তে মুছিতে মুছিতে

বাড়ী ফিরিয়া যাইত এবং এই মা'রের কথা সে কাহাকেও বলিত না, এমন কি, তাহার বন্ধুকেও সে তজ্জন্য একটিবারও অনুযোগ দিত না।

পাঠশালায় তাহার গুরু ছিল গোবর্দ্ধন (ওরফে গোব্‌রা) সাহা। তাহার একটা পা খোঁড়া ছিল; রাগিলে খোঁড়া পা'টা লইয়া সে এত দ্রুত ঘরের একদিক্ হইতে অন্যদিকে যাতায়াত করিতে থাকিত, যেন মনে হইত, একখানি ডিঙ্গি নৌকা চড়ায় একবার আট্‌কাইতেছে ও পুনরায় হাওয়ার জোরে চলিতেছে। একদিন সেই পাঠশালার পার্শ্বে একটা হাতী যাইতেছিল। এই বৃহদাকার অপূর্ব্ব জন্তুটিকে দেখিবার জন্য অনেক ছেলের সঙ্গে নীলমাণিকও জানালার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। ক্রুদ্ধ গোব্‌রা মশাই খোঁড়া পা লইয়া সেই জানালার দিকে আসিতেছে দেখিয়া অপর সকল ছেলে তাড়াতাড়ি যে যা'র স্থানে যাইয়া বসিল। নীলমাণিক হাতী দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিল; সে তখন "গজপৃষ্ঠ হৈতে

বীর নেহালে শ্রীরাম" এই পদটি গুণ্ গুণ্ করিয়া আওড়াইতেছিল ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া হাতীর পাদক্ষেপের প্রতি চাহিয়াছিল ; পশুপ্রবরের পাদক্ষেপ সে শুনিতে পায় নাই। গুরুবর আসিয়াই নীলমাণিকের নাসিকাগ্র সজোরে ধারণ করিয়া তাহাকে যথাস্থানে বসাইয়া দিল। নীলমাণিকের বর্ণটি ছিল স্নিগ্ধ শ্যাম, তাহার নাকটি ছিল তিলফুলটির ন্যায়। সেই শ্যামল নাসিকাগ্র গুরুপীড়নে জবাকুসুমের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। বাড়ী ফিরিলে নীলমাণিকের মা ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"এ কি, তোর নাক এরূপ লাল হ'ল কেন ?" নীলমাণিক স্তব্ধ হইয়া একখানি ছবির মত দাঁড়াইয়া রহিল—কিছু বলিল না। গুরু-ভয়ে সঙ্গী একটি ছেলে বলিল—"নীলার নাকে বল্ লাগিয়াছে, ব্যাট্-বল খেলিতেছিল।" অন্নপূর্ণা চক্ষের জল সামলাইয়া লইয়া নিজের স্নিগ্ধ অঞ্চলটি দ্বারা নীলমাণিককে আবরিয়া লইল এবং বলিল, "নীলু, ষাট্ আমার, তোকে আর ব্যাট্-বল্ খেলতে দিব না।"

গোবরা-মশাই একটি অপূর্ব্ব জীব ছিল; তাহার বিচার-পদ্ধতি একান্ত মৌলিক—অবশ্য সব সময়ে সুবিচার হইত না। পাঠশালায় কোন ছেলে গোল করিলে বেত লইয়া সে তাহাকে মারিতে ছুটিত; কিন্তু খোঁড়া পায়ে অর্দ্ধেক পথ যাইতে যাইতে, কে গোল করিয়াছে, তাহা ভুলিয়া যাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী অপর কোন ছেলের পিঠে সপা-সপ্ বেতের বাড়ি মারিতে থাকিত। গুরু মশাইএর এক ছেলে ছিল—নাম তার 'রতন'। আহারান্তে অপরাহ্ণে পাঠ-শালায় যাইতে সে প্রায়ই ঘোরতর আপত্তি করিত; গোব্‌রা ছেলেকে সঙ্গে লইয়া রোজ রোজই তাহার পাত্তাড়ি, কলম ও বই নিজে বহিয়া লইয়া পাঠশালায় উপস্থিত হইত। সময়ে সময়ে দেখা যাইত, দুষ্ট বলদ যেরূপ কিছুতেই গাড়ীর জোয়ালে মাথা ঢুকাইতে চাহে না—রতন বাবাজীও সেইরূপ পাঠশালা-ঘরে ঢুকিবার সময় দৌড় মারিয়া ছুটিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে; গোব্‌রা পুত্রের খাতাপত্রের পুঁটুলিটি হাতে করিয়া ছেলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ

তাহাকে ধরিবার জন্য খোঁড়াইয়া চলিতেছে। ছেলে দূরে না যাইয়া পাঠশালা-ঘরের চতুর্দ্দিকে দৌড়াইতেছে—ও তাহার পিতা ব্যর্থ অনুসরণে সেই গৃহ পরিক্রম করিতেছে। পুত্রের প্রতি অতিরিক্ত বাৎসল্য বশতঃ অপর কোন ছেলেকে দিয়া সে তাহাকে ধরাইতে চাহিত না; পাছে তাহার দুর্ব্বল ছেলেটি অপর ছেলেদের হাতে কোনরূপ আঘাত পায়।

৩

এই গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় নীলমাণিক নানারূপ মা'র-ধর খাইয়া বিদ্যাচর্চ্চা করিতে লাগিল। অন্য ছেলেরা যে সকল অপরাধ করিত, অনেক সময় তাহা নীলমাণিকের কাঁধে চাপাইয়া দিয়া তাহাকে মা'র খাওয়াইত। নীলমাণিক মা'র খাইয়া কাঁদিত, কিন্তু 'আমি করি নাই' বলিতে পারিত না, লজ্জায় সে কথা মুখে ফুটিত না; অপর ছেলেদের দোষের কথাও বলিতে তাহার প্রবৃত্তি

হইত না। ইহা ছাড়া সর্ব্বদা অন্যমনস্কভাবে পথে চলার দরুণ খানায় পড়িয়া কখনও তাহার ইটে পা কাটিয়া যাইত, কখনও কাঁটা-গাছের পাশ দিয়া দৌড়াইয়া যাইবার সময় তাহার পিঠে কাঁটা বিঁধিত। এইভাবে সারাদিনের পর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া সে যখন গৃহে ফিরিত, তখন অন্নপূর্ণা তাহার শরীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে চক্ষের জল ফেলিত এবং বলিত, "কবে নীলা, তুই অপর ছেলেদের মত হ'বি? তুই কখন্ সাপের মুখে পড়্‌বি বা জলে পড়িয়া প্রাণ দিবি আমার কেবল সেই ভয়! নীলু আমার, তুই শান্ত ভাল ছেলে হয়ে থাক্।" নীলা কিছুই বলিত না, মায়ের স্নিগ্ধ হস্ত-স্পর্শে তাহার সমস্ত কষ্ট জুড়াইয়া যাইত; মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িত। কখনও মাতাপুত্রে নানারূপ কথাবার্ত্তা চলিত। রায়বাবুদের 'শ্যামরাজের' মন্দিরটি বিচিত্রবর্ণের পাথরে প্রস্তুত, রোজ মায়ের সঙ্গে নীলা সেই ঠাকুর প্রণাম করিতে যাইত। তখন তাহার কত উৎসাহ! একদিন সে বলিল, "মা, শ্যামরাজের

মন্দিরটি ঠিক একখানি সোনার আঁচলা দেওয়া নীল সাড়ীর মত—যেন বাতাসে উড়িয়া যাইতেছে।” আর এক দিন আকাশে কৃষ্ণবর্ণ পাখীর সারি দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল—“মা, দিদি না বলেছে যে, স্বর্গে চিত্রগুপ্ত খাতাপত্র রাখে? তাহার কলমের কালী আকাশময় ছিটকাইয়া পড়েছে।” একদিন শীতের প্রাতে বাড়ীর পুকুর হইতে কোয়াসা উঠিতে দেখিয়া তাহার মাকে সে বলিল—“মা, রাত দুপুরে কে পুকুরটা এমন গরম করিয়া রাখে যে, সকাল বেলা পর্য্যন্ত এমন ধোঁয়া উঠে?” এইরূপ শত-শত অনর্থ কাকলী দ্বারা নীলমাণিক তাহার মাতার কর্ণ পরিতৃপ্ত করিত।

ভগবান্ অধিকারী কীর্ত্তন গাইতে দূরে যাইত, কিন্তু দুই একদিন পরেই নানারূপ ফল ও খাদ্যদ্রব্য নীলমাণিকের জন্য পাঠাইয়া দিত। শীতকালে কমলা লেবু, তিলা ও কদ্‌মা আসিত; গ্রীষ্মকালে ফুটি, তরমুজ প্রভৃতি মোট বাহক লইয়া আসিয়া ঘরের প্রাঙ্গণে হাজির করিত।

তাহাদের বাগানে আম-কাঁটাল প্রচুর হইত, সুতরাং অধিকারী তাহা আর পাঠাইত না। সে সকল দিন কি সুখেই না যাইত! কোন দিন দিদি হয় ত প্রায় বীরবাহুর পালা সমাপ্ত করিয়াছেন। রামের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত বীরবাহুর হাতীকে খোঁচাইতে যাইয়া সুগ্রীব বানর বিশাল শুণ্ডের এমনই তাড়া খাইয়াছে যে, তাহার হাড়-মাস চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। নীলমাণিক তাহাতে খুব আনন্দিত,—চিন্তাদিদির মুখের পয়ারগুলি সে প্রায় গিলিয়া খাইতেছে। এমনই সময় অধিকারীর লোক আসিয়া হয় ত ঘরের উঠানে মোট নামাইল, অমনই নীলমাণিক কমলা লেবু ও তিলা লইয়া আনন্দে কলরব করিয়া উঠিল। উত্তর-কালে নীলমাণিক বড়মানুষ হইয়াছিল, কিন্তু এমন মিষ্টদ্রব্য বোধ হয় তাহার আর জোটে নাই। অর্দ্ধঘণ্টা কাল এই উপঢৌকন লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া দিদির পার্শ্বে আবার সে আসিয়া বসিত। তখন দিদি পড়িতেছে—অতিকায়ের যুদ্ধের কথা। বীরবাহুর পালা শেষ করিয়া মহীরাবণের কথা পড়িতে যাইবে,

এমন সময়ে ও পাড়ার ধনী মাসী বায়না ধরিল—সে দিন সে অতিকায়ের যুদ্ধ-কথা শোনে নাই। দিদি সুর করিয়া পড়িতে লাগিল—পাঁচ বীর যুদ্ধে নিহত হইয়াছে; হাতে ধনু ধীর পাদক্ষেপে অতিকায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা, দূর্ব্বাদলশ্যাম রামচন্দ্র তাঁহাকে যেন পাদপদ্মে স্থান দেন। যুক্তকরে সে বলিল—"আমি রাবণের পুত্র বলিয়া যদি দয়া না কর, তবে হে রাম! তোমার দয়াময় নামে কলঙ্ক পড়িবে।" এইটুকু শুনিতে শুনিতে কে জানে কেন, নীলমাণিকের চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া গেল। চিন্তা বলিল—"তুই যদি কাঁদ্‌বি, তবে পড়্‌তে পার্‌ব না। তোর কান্না দেখ্‌লে আমারও কান্না পায়! তুই একটা মেয়ের মত হয়েছিস্ কেন বল্ দেখি? একটু কিছু হলেই দুটি চক্ষে শায়ণের ধারা ব'য়ে যাবে।"

নীলমাণিক মাকে প্রায়ই অযথা কষ্ট দিত। ঠিক সময়ে অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া মা বসিয়া থাকিত, কিন্তু নীলা স্নান করিতে যাইয়া নদীর জলে দুই তিন ঘণ্টা সাঁতার

কাটিত। কানাই নদের জলে নামিলে কা'র সাধ্য তাহাকে উঠায়? মা অনেক সাধিয়া, বুঝাইয়া যখন তাহাকে বাড়ীতে লইয়া আসিয়াছে, তখন ডুব দিতে দিতে তাহার দুটি চক্ষু গাঁজাখোরের চক্ষের ন্যায় লাল হইয়া গিয়াছে। মাতার ভৎর্সনা সে একেবারেই উপেক্ষা করিত। কখনও রাগ করিয়া সে ভাত ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। কোথায় গিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। অন্নপূর্ণা নানাস্থানে খুঁজিয়া তাহার সন্ধান পায় নাই। কখনও রাত দুপুরে অন্ধকার জঙ্গলের পথে সে কীর্ত্তন শুনিয়া আসিতেছে। পাছে তাহাকে সাপে খায়, এই ভয়ে তাহার মা একবার ঘরে একবার বাহিরে যাইতেছে। এই ভাবে দিন-রাত তাহার মাতাকে সে জ্বালাতন করিত।

৪

অধিকারীরা তিনপুরুষ যাবৎ কীর্ত্তন গান করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছে। ভগবান্, ভাল কীর্ত্ত-

নিয়া বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। তাহার বাড়ীতে রাধাবল্লভজীর সেবা ছিল। বাড়ীতে থাকার সময় প্রায়ই ঠাকুর-মন্দিরের রকে বসিয়া সে নাম জপ করিত। অন্নপূর্ণাও মধ্যে মধ্যে সেখানে আসিত, কিন্তু তাহা নীলমাণিকের কোন পীড়া বা চরিত্রের উপসর্গ শোধরাইবার চেষ্টায়; রাধাবল্লভ তাহার বাপ-মা-সহায়-মুরুব্বি সকলই। আজ নীলু, কাঁটালের কোয়া খাইয়া পেট-বেদনায় কষ্ট পাইতেছে —ঠাকুর, উহার পেটের ফাঁপ সারাইয়া দাও; আজ বোলতার কামড়ে দুরন্ত ছেলেটির পিঠ ফুলিয়া গিয়াছে;—ঠাকুর, তোমার পদ্মহস্ত বুলাইয়া উহার পিঠ সমান করিয়া দাও; আজ নীলুর সর্দ্দি, কাল নীলুর অ-ক্ষিদা অর্দ্ধেক ভাত পাতে পড়িয়া আছে—মোটেই খাইবার রুচি নাই; রাধাবল্লভের কানে এই সকল অভিযোগ দিনরাতই অন্নপূর্ণা তুলিত। সব শেষে করযোড়ে আঁচল গলায় দিয়া অন্নপূর্ণা বলিত— "হে ঠাকুর, আমার নীলুর বুদ্ধিটা শোধরাইয়া দাও—বড় অবোধ—সকলে উহার উপর অত্যাচার করে, কিন্তু

উহার মত সাদা প্রাণ কাহারও নাই। উহাকে যেন কেহ ঠকাইয়া কষ্ট না দেয়, ঠাকুর, তুমি তা'ই দে'খ।" কিন্তু মা, তুমি জান না—যে ভাল, তাহাকে সকলেই ঠকাইবে—সে ঠকের হাতে পড়িয়া সাধু থাকিবে। রাধাবল্লভ বোধ হয়, অন্নপূর্ণার সকল প্রার্থনাই পূর্ণ করিয়াছিলেন,কিন্তু শেষেরটি নয়। কারণ, নীলমাণিক জীবনে আরও বহুবার ঠকিয়াছে।

ভগবান অধিকারীর ভক্তিতে কামনা ছিল না। তাহার প্রাণাধিক পুত্রটিকে দেখিলে সে সুখী হইত—তাহাকে কাছে বসাইয়া আশীর্ব্বাদের ছলে মাথায় ও গায়ে হাত বুলাইয়া দিত। শার্দ্দূল যেরূপ তাহার ক্রীড়কের পোষ মানে, নীলমাণিকও সেইরূপ তাহার পিতার স্পর্শে দুই দণ্ড চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। কিন্তু সে যখন চলিয়া যাইত, ভগবান তখন আবার রাধাবল্লভকে লইয়া সমস্ত ভুলিয়া থাকিত। একদিন অধিকারী তাহার স্ত্রীকে বলিল, "তুমি নীলুকে লইয়া এত ব্যস্ত যে রাধাবল্লভের সেবা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতেছ—অতটা জড়াইও না।" অন্ন-

পূর্ণা হাসিয়া বলিল, "তোমার কাছে ঐ পাথরের ঠাকুর রাধাবল্লভ, আমার কাছে নীলুই আমার রাধাবল্লভ। নীলুর সেবাই আমার রাধাবল্লভের সেবা। আমার নীলুকে ঠাকুর দেবতারা ভাল রাখুন, আমি এ যাত্রা এই সেবা করিয়াই যাইব।"

রাজপুরের বিখ্যাত জমিদার মদন চৌধুরী ভগবান অধিকারীকে খুব ভালবাসিতেন। তিনি অধিকারীর কীর্ত্তনের খুব গোঁড়া ছিলেন। একদিন ভগবান অধিকারীর বাড়ীতে তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। অত বড় জমিদার নারাণপুরে কখনও আসেন নাই। নীলমাণিককে সঙ্গে লইয়া অধিকারী, চৌধুরী মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিয়া মন্দির-সংলগ্ন বহির্ব্বাটীতে লইয়া আসিল। মদন চৌধুরী বলিলেন, "অধিকারী, তোমার ছেলেটি বেশ, ওর কোঁকড়ান চুলে ও শ্যামবর্ণে ওকে ঠিক্ কৃষ্ণঠাকুরের মত দেখাচ্ছে; শ্যামবর্ণে এমন সুন্দর ছেলে আমি কখনও দেখি নাই।" পিতার ইঙ্গিতে নীলু ব্রাহ্মণ জমিদারের পায়ে

গড় করিল। চৌধুরী উপবেশন করিয়া ভগবানকে বলিলেন, "দেখ অধিকারী, আমরা শাক্ত, তোমার মহাপ্রভুকে বুঝিতে পারি, কিন্তু নিত্যানন্দের নামে অনেক অপবাদ আছে। আমার বিশ্বাস, বৈষ্ণবেরা মহাপ্রভুর সঙ্গীদের অনেককে বাড়াইয়া গিয়াছে। নিত্যানন্দের সম্পর্কে অনেক লোকে অনেক কথা বলে, এজন্য উহাঁর উপর আমার সেরূপ ভক্তি হয় না।" অধিকারী বলিল, "রাধাবল্লভ একদিন না একদিন আপনাকে বুঝাইবেন, আমি কি বলিব? আমার কি সাধ্য যে, আপনার ন্যায় পণ্ডিতকে আমার মতে লওয়াই।" চৌধুরী—"আচ্ছা সে সকল কথা যা'ক—তুমি এক আধ্‌খানা পদ গাও। তুমি যে সকল পদ আমার বাড়ীতে গাহিয়া থাক, তাহার রেশ্‌ বহুদিন আমার কানে বাজিতে থাকে।" আর দ্বিরুক্তি নাই,—অমনি ভগবান অধিকারী গান আরম্ভ করিয়া দিল—

"অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়"

একটি লোক আস্তে আস্তে খোলে ঘা' দিতে লাগিল। অধিকারী গদ্গদ-কণ্ঠে গাহিতে লাগিল, "অক্রোধ পরমানন্দ"—এই দু'টি কথা পুনঃ পুনঃ গাহিতে গাহিতে তাহার চক্ষু হইতে জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল; মদন চৌধুরীর চক্ষুও জলশূন্য রহিল না। কিছুকাল ধরিয়া আত্মবিস্মৃতভাবে সাশ্রু-চক্ষে অধিকারী কেবল একটি ছত্র গাহিল—"অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়"—কখনও কণ্ঠ গদগদ, কখনও আকাশের কোন অদৃশ্য দেবতার দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেত করিয়া—আনন্দের মূর্ত্তি—ক্রোধশূন্য—দ্বেষশূন্য—কাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অধিকারী দেখাইতেছে! এত পড়িয়া শুনিয়া মদন চৌধুরী যাহা বোঝেন নাই, এই একটি ছত্র পুনঃ পুনঃ গীত হইয়া তাহা তাঁহাকে বুঝাইল—আনন্দময় শিবতুল্য মহাপুরুষ যেন সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, তিনি দেখিতে পাইলেন। গায়কের যদি ভক্তি থাকে, তবে তাহার কণ্ঠস্বর মর্ম্ম স্পর্শ না করিয়া যায় না। একান্ত তন্ময় হইয়া যখন অধি-

কারী সেই ছত্রটি গাহিতে লাগিল—তখন যিনি জগাইএর হাতে মার খাইয়া রক্তাক্ত-দেহে ক্রোধের পরিবর্ত্তে আনন্দ দিয়াছিলেন—আজ যেন সেই মহাপুরুষের সঙ্গে চৌধুরী মহাশয়ের সাক্ষাৎকার হইয়া গেল। ইহার পরের ছত্রে নিত্যানন্দের মানস-ছবি আরও উজ্জ্বল হইল—"অভিমান-শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়।" নিন্দা-প্রশংসার অতীত একান্ত নিরহঙ্কার নিত্যানন্দ উদ্ধারণ দত্তের রাঁধা ভাত খাইতেছেন, যত ছোটজাতকে নিজের উদার হৃদয়ের ভালবাসা দিয়া আপন করিয়া তুলিতেছেন। পতিত জাতির এমন বন্ধু আর হয় নাই। এই ব্রাহ্মণের অভেদ-বুদ্ধিতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম আবার উদার হইয়া উঠিয়াছে —গোঁসাইএর দলের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজ পতিত জাতিদের জন্য রুদ্ধদ্বার খুলিয়া দিতেছেন; বণিক্-জাতিরা সমাজের বাহিরে ছিল—ব্রাহ্মণগণ তাহা-দিগকে দীক্ষা দিয়া শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন, তাহাদের ঘরে ঘরে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

এই অক্রোধ পরমানন্দ ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ নগরে বেড়াইয়া—মান অভিমান বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পতিত জাতিকে উদ্ধার করিয়া লইতেছেন। অধিকারী কোন তর্ক-বিতর্ক ক'রে নাই ; সে নিজে কাঁদিয়া তাহার আরাধ্য দেবতাকে দুটি ছত্রে চিনাইয়া দিল। চৌধুরী নির্ব্বাক্ হইয়া নিত্যানন্দের অপূর্ব্ব রূপ ধ্যান করিতে লাগিলেন। তা'র পর অধিকারী বলিল—"একটি পদ আপনারা পথে ঘাটে অনেকবার শুনিয়াছেন—আপনারা জানেন না, উহা নিত্যানন্দের রচিত ; সে'টি এইবার গাচ্ছি।" খোলওয়ালাকে খোল ঠুকিতে সঙ্কেত করিয়া অধিকারী আবার গাহিল :—

"ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জনা গৌরাঙ্গ ভজে, সে জন আমার প্রাণ রে ॥"

গৌরাঙ্গকে নিত্যানন্দ কত ভালবাসিতেন, এই গানটিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। একবার যে গৌরাঙ্গের নাম লইয়াছে, সেই নিত্যানন্দের প্রাণ-সম হইয়া

গিয়াছে। এই ভালবাসায় টলিতে টলিতে মত্তপায়ীর মত নিত্যানন্দ পথে চলিতেন এবং গরীব-দুঃখী ও পতিত জাতির ঘরে ঘরে প্রেমামৃত বিলাইতেন।

প্রায় এক ঘণ্টা কাল চৌধুরী মহাশয় অধিকারীর মুখ-নিঃসৃত এই অপূর্ব্ব ভক্তি-সঙ্গীত শুনিয়া ধন্য হইলেন। সেই দিন তিনি অধিকারীকে ৫০ বিঘা নিষ্কর জমি দান করিয়া স্বয়ং নিত্যানন্দের প্রতি অগাধ ভক্তি অর্জ্জন পূর্ব্বক গৃহে ফিরিলেন।

৫

নীলমাণিককে ইহার পর ইংরেজী বিদ্যালয়ে যাইতে হইল। হেডমাষ্টার রজনীবাবু বিদ্যার জাহাজ। একদিন ইন্স্পেক্টার ফ্র্যান্সিস সাহেব স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন; সে দিন মাথা-ঘোরার ভাণ করিয়া রজনী মাষ্টার জল-খাবারের ঘরে লুকাইয়া ছিলেন। সেকেণ্ড মাষ্টার প্যারীবাবু সে দিন তাঁহার ভাঙ্গা ইংরাজী

ও বহু সেলামের জোরে কার্য্য নির্ব্বাহ ও ইন্‌স্পেকটার সাহেবের মনোরঞ্জন করিয়া দিয়াছিলেন। লোকে বলিত, রজনীবাবুর বিদ্যা আছে, মুখের জোর নাই। কিন্তু ছেলেদের কাছে মুখ-জোরের কোন অভাবই ছিল না—দিনরাত্রি তুবড়ীর মত তাঁহার মুখ ছুটিত। তিনি না বুঝিতেন, এমন শাস্ত্র নাই,—বেদের প্রসঙ্গে সায়নাচার্য্যের ভুল বাহির করিতেন; বাল্মীকি তাঁহার মতে কবিই ছিলেন না—কারণ, তিনি এক একটা বানরের একক্রোশ-ব্যাপী লেজ কল্পনা করিয়াছেন। এরূপ অসম্ভব কথা যে লেখে, তাহার কাব্য কি পড়িবার জিনিষ? রাজা রাম-মোহন রায় সতীত্বের প্রকৃত মূল্য বোঝেন নাই—তাহা হইলে কি তিনি সতী-দাহ নিবারণ করেন? চৈতন্যদেবের মাথা বিগড়াইয়া গিয়াছিল—এজন্য প্রলাপ বকিতেন ও মূর্চ্ছা যাইতেন। বিদ্যাসাগর শৈশবে ভাতের সঙ্গে আরশোলা গিলিয়া ভাল করেন নাই—ভয়ানক অসুখ হইতে পারিত। রামকৃষ্ণ মূর্খ ছিলেন,

বিবেকানন্দ ও কেশবচন্দ্র এই দুইজনে উপলক্ষ্য হইয়া তাঁহাকে বাড়াইয়া গিয়াছেন—তাই তাঁহার এত মান! এইরূপ মত সকল তাঁহার মুখ হইতে অজস্রভাবে নির্গত হইত, এবং শ্রোতৃবর্গ তৎসম্বন্ধে আপত্তিজনক তর্ক উপস্থিত করিলে, অমনই নস্য লইয়া মিল্টনের প্যারা-ডাইস লষ্ট হইতে "Of man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree," কিংবা সেক্ষপীয়র হইতে "Why thy canonized bones, hearsed in death" প্রভৃতি ছত্র বিপুল উৎসাহে আওড়াইতে থাকিতেন। পাড়াগাঁয়ের ভদ্রলোক মিল্টন-সেক্ষপীয়রের তত ধার ধারিতেন না—তাঁহারা একেবারে বোকা বনিয়া যাইতেন।

একদিন রজনীবাবু বাজারের পথে যাইতেছেন—তাঁহার সঙ্গে ছিল আমাদের নীলমাণিক। সে ইংরাজী ফার্ষ্ট বুক সারিয়া সেকেণ্ড বুকের ভেড়ার গল্প পর্য্যন্ত পড়িয়াছে; রজনী মাষ্টারের অধস্তন পঞ্চম মাষ্টার তাহার শিক্ষক;

সুতরাং রজনী মাষ্টার যে কত বড়, তাহার ইয়ত্তাই সে করিতে পারে না—বিদ্যাবত্তায় তাহার চক্ষে রজনী মাষ্টার কাঞ্চনজঙ্ঘার উচ্চতম চূড়া। শুদ্ধ ভক্তির সহিত সে প্রধান শিক্ষকের পাছে পাছে যাইতেছে; এমন সময়ে দেখা গেল, এক দোকানে বসিয়া বৈষ্ণব ভিখারী গাহিতেছে। কৃষ্ণের সাজ-পরা, ময়ূর-পুচ্ছ মাথায়, নূপুর পায়ে, নাকে কপালে ও গণ্ডে তিলক-পরা একটা ছোঁড়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে আর গাহিতেছে—"যদি বল শ্যাম হেঁটে যেতে চরণ ধূলায় ধূসর হবে—ব্রজ-বালাদের নয়নজলে চরণ পাখালিবে—ধূলো তোর লাগ্‌বে না হে।" বালকের পিতা খঞ্জনী বাজাইয়া মোটা গলায় গাহিয়া দিতেছে, ছেলেটি নূপুর-শিঞ্জিত-পদে নাচিয়া নাচিয়া তরুণ-কণ্ঠে সেই গীত গাহিতেছে। সেই স্নিগ্ধ করুণ সুরে, বালকের কৃষ্ণ-সুষমায়, খঞ্জনী ও নূপুরের শব্দে নীলমাণিকের মনে তাহার চির-পরিচিত বৈষ্ণব-ভাব জাগিয়া উঠিল ও তাহার চক্ষের এক কোণে

অশ্রু দেখা দিল। রজনীবাবু সেই গানের একটু আধটু শুনিয়া, সঙ্গী অপর এক মাষ্টারকে বলিলেন,—"এই ন্যাকামী সুর আমার মোটেই ভাল লাগে না। মনোহর-সাইটা হচ্ছে সুরের গুঁছা, ভাল খেয়ালী এই সুরটা শুন্‌লে কানে আঙ্গুল দেয়।"

এত বড় বিদ্যা-বুদ্ধি যাঁহার, তিনি যাহা বলিয়া গেলেন,নীলমাণিক দাঁড়াইয়া তাহা ভাবিতে লাগিল,—"এ যদি ন্যাকামী হয়, তবে ইহা আমার এত ভাল লাগ্‌ছে কেন? কোকিলের কুহুর মত আমার মনকে ইহা ভুলাচ্ছে কোন্ গুণে?"

বাড়ী আসিয়া সে তাহার পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—"হ্যাঁগা বাবা, তোমরা যে কেত্তন গান কর, সে কি ন্যাকামী?" "কেন বাবা, এ কথা তোমাকে কে বল্লে?" বালক সেই দিনকার ঘটনাটি বলিয়া মুখ ভার করিয়া পিতার নিকট দাঁড়াইয়া রহিল। ভগবান অধিকারী সেই দিন ইংরেজী স্কুল হইতে তাহার

নাম কাটাইয়া লইল, এবং বীরভূম জেলায় ময়নাডালার মিত্র-ঠাকুরদের বাড়ীতে তাহাকে কীর্ত্তন শিখাইবার জন্ত পাঠাইতে স্থির করিল। সে নিজেও সেইখান হইতে কীর্ত্তন শিখিয়া আসিয়াছিল।

৬

ময়নাডালা যাইবার পূর্ব্বে নীলমাণিকের বিবাহ হইয়া গেল। ভগবান অধিকারী তাহাদের গ্রামের নিকটবর্ত্তী আমডালা গ্রামের রূপলাল বৈষ্ণবের কন্যা রাণীর মুখখানি দেখিয়া তাহার সহিত পুত্রের বিবাহ স্থির করিয়াছিল। রাণী পাড়াগেঁয়ে মেয়ে হইলেও রূপে ও বুদ্ধিতে সহুরে মেয়ের সেরা। নীলমাণিক এখন অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে; সে বিবাহ করিয়া মা বাপের পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া ময়নাডালা চলিয়া গেল।

অন্নপূর্ণা সেই রাত্রি কাঁদিয়া কাটাইল। নীলুকে

ছাড়িয়া ইহার পূর্ব্বে সে একদিনও থাকে নাই। কিন্তু স্বামী যখন তাহাকে ব্যবসায় শিখাইবার জন্য প্রবাসে পাঠাইতে কৃতসঙ্কল্প, তখন সে বাধা দেয় নাই। পুত্রের প্রতি তাহার মমতার অন্ত ছিল না, কিন্তু সে পুত্রের উন্নতির পথ আগ্‌লাইয়া থাকা সঙ্গত মনে করে নাই। সে পরদিন হইতে দিনে তিনবার করিয়া রাধাবল্লভের দ্বারদেশে পড়িয়া কাঁদিত;—সকাল হইলে তাঁহার নিকটে যাইয়া বলিয়া আসিত—"ঠাকুর, আ'জ-কার দিন যেন নীলু ভাল থাকে।" দুপুর বেলায় বলিত,—"ঠাকুর, আজ যেন নীলু গাছে উঠিয়া ডাল ভাঙ্গিয়া না পড়ে—জলে সাঁতার কাটিয়া জ্বর করিয়া না বসে।" সন্ধ্যাকালে রাধাবল্লভকে বলিয়া আসিত,—"রাতে যেন নীলুর ভাল ঘুম হয়, দুঃস্বপ্ন দেখিয়া মা বলিয়া যেন সে কাঁদিয়া না উঠে।" নারাণপুরে মধ্যে মধ্যে স্বপ্ন দেখিয়া নীলু ঐরূপ কাঁদিয়া উঠিত।

এ দিকে ময়নাডাঙ্গা যাইয়া সরল মিত্রের নিকট

নীলু সুর ভাঁজিতে সুরু করিল। ইহাঁরা খুব ওস্তাদ ছিলেন। নীলু গড়ণহাটা, রেনেটি ও মনোহরসাই এই তিন সুরে কীর্ত্তন শিখিল। গড়ণহাটা গুরু সুর, কিন্তু মনোহরসাইতে কীর্ত্তন জমে ভাল। সরল মিত্রের কীর্ত্তন জমাইবার দিকে একেবারেই লক্ষ্য ছিল না। তিনি ওস্তাদী সুর শিখাইতেন। "সাধারণ লোকের যেটা ভাল লাগে, শুধু তা'র দিকে লক্ষ্য রাখিলে তুমি গান শিখিবে না, ছুঁচোর কীর্ত্তন শিখিবে।" শিষ্যগণকে এই উপদেশ দিয়া তিনি কীর্ত্তন শিখাইতে সুরু করিতেন। নীলা, দশকুশী, লোভা প্রভৃতি তালে সমস্ত গান অভ্যাস করিতে লাগিল। সরল মিত্র বলিতেন, —"এ ছেলেটি খুব একাগ্র, কিন্তু মনোহরসাহীর দিকে ইহার ঝোঁক,—খুব বড় তাল, বড় সুর ধরিতে পারে; কিন্তু সে পথে সহজে সে যাইতে চায় না।"

বৎসরের মধ্যে দুইবার সে বাড়ী আসিতে ছুটি পাইত। এক একবার এক এক মাস করিয়া

বাড়ীতে থাকিয়া যাইত। তাহার আসিবার দিন ঠিক্ হইলে, এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে অন্নপূর্ণা তাহার নিরাপদ আগমন কামনা করিয়া রোজ দশ হাজার বার নাম জপ করিত ও রাধাবল্লভের দরজায় বসিয়া চোখের জল মুছিতে থাকিত।

প্রথমবার যখন সে ফিরিয়া আসিল, তখন অন্নপূর্ণা দেখিল, নীলু কিছু রোগা হইয়াছে ;—পুত্রকে বাহু-বেষ্টিত করিয়া সে সাদরে জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁ রে নীলু, তুই এত রোগা হয়ে গেছিস্ কেন ?" নীলু বলিল—"মা, সেখানে বড় পরিশ্রম কর্‌তে হয়—তা'ছাড়া খাওয়াটা ঠিক বাড়ীর মতন হয় না।" অন্নপূর্ণা জানিত, নীলুকে সে কাছে বসাইয়া না খাওয়াইলে তাহার পেট ভরে না। সে নিজে ক্ষুধা বোঝে না—"এটা খাও—সেটা খাও—না, খেতেই হবে"—বারংবার এইরূপ বকিয়া তাহাকে খাওয়াইলে তবে তাহার পেট ভরে। পুত্রের কথা শুনিয়া জননীর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল, এবং যখন তাহার

নিজের কোন সাধ্য নাই—তখন সেই রাধাবল্লভকেই তাহার মনে পড়িল। 'আমি ত খাওয়াইতে পারিব না, তুমি ঠাকুর, জলে স্থলে সবখানেই আছ, তুমি ময়না-ডাঙ্গাতে হাত ধরিয়া আমার নীলুকে খাওয়াইও। ও বড় অবোধ, নিজে খাইতে পর্য্যন্ত জানে না।'

সেই দিন সন্ধ্যায় পিতার কাছে বসিয়া নীলু গল্প করিতেছিল, এমন সময় একটি কল্কেতে তামাক সাজিয়া তাহাতে ফুঁ দিতে দিতে চৌদ্দ বৎসরের বউ রাণী সেই ঘরে উপস্থিত হইল। টিকাটায় ভাল করিয়া আগুন ধরে না এজন্য প্রদীপের উপর টিকা ধরাইয়া সেই আলোর নিকট দাঁড়াইয়া বধূ ধীরে ধীরে ফুঁ দিতে লাগিল। হঠাৎ টিকার আগুনের দীপ্তিতে তাহার সুন্দর অধর, নাসিকা ও মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া নীলুর চক্ষে পড়িল। নীলু ইহার পূর্ব্বে স্ত্রীকে ঘোমটার আড়ালে দেখিয়াছিল, কিন্তু সে যে এত সুন্দর, তাহা দেখে নাই। এইবার রাণীর রূপ দেখিয়া সে মুগ্ধ হইল।

ইহার পরে রাণীর জন্য সে একবারে পাগল হইয়া উঠিল। দিনরাত্র রাণীর সঙ্গে সঙ্গে থাকে ;—এমন কি, হিন্দু পরিবারে নব-দম্পতির যে সহজ লাজ-শীলতা, তাহারা তাহাও অতিক্রম করিয়া চলিল। চিন্তা দিদির ইহা মোটেই ভাল লাগিত না, বাড়ীর অপর সকলের চক্ষেও ইহা উৎকট বলিয়া বাজিল। কিন্তু সে আর কয়েকটা দিন মাত্র বাড়ী থাকিবে, যাহা খুসী করুক, এই ভাবিয়া অন্নপূর্ণা আর তাহাদিগকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিল না। যথাসময়ে অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া, ঠাকুরের দুয়ারে ধন্না দিয়া, নীলুর মা তাহাকে ময়নাডাঙ্গায় যাওয়ার জন্য যাত্রা করাইল এবং সে চলিয়া গেলে বউকে বলিল, "বউমা, দশজনের ঘর, দশ জন যাহাতে ভাল বলে, এমনই ভাবে চল্‌তে হয়। স্বামীর সঙ্গে যে ভাব, তাহা অন্যে টের পাবে কেন? কুঁড়ির ভিতর গন্ধটুকুর মত তা' মনের ভিতর লুকায়ে থাক্‌বে।"

এই উপদেশ রাণীর মোটেই ভাল লাগিল না। সে

চুপ করিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল। অন্নপূর্ণা একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিল এবং এ বিষয়ে আর কোন উপদেশ দিল না।

৭

এবার নীলুর খাওয়া-দাওয়ার যাহাতে সুবিধা হয়, এজন্য ভগবান তাহাকে বেশী করিয়া টাকা দিয়াছিল। কিন্তু খাওয়ার দিকে মোটেই লক্ষ্য না করিয়া সে সেই টাকা দিয়া বউএর জন্য নানারূপ চুড়ী, কাপড় ও সাবান কিনিয়া রাখিল। রাণীর ফর্সা হাতে রক্তবর্ণ চুড়ী মানাইবে ভাল, এজন্য একজোড়া লাল চুড়ী কিনিল; তার পর ভাবিল—'না—নীল চুড়ীতে সাদা হাত দুটির শোভা আরও বেশী হইবে'। সুতরাং নীল চুড়ীও কেনা হইল। সাদা জুঁইফুলের মত দেহে নীলাম্বরী মানাইবে ভাল, এই ভাবিয়া সে নীলাম্বরী কিনিল। আবার ভাবিল, ফিকে গোলাপী রংএর সাড়ীতে ফর্সা

চেহারা বেশ উজ্জ্বল দেখাইবে—এই ভাবিয়া সে গোলাপী সাড়ী কিনিল। ভাবিতে ভাবিতে কোন্ রং রাণীর অঙ্গে মানাইবে ভাল, ঠিক করিতে না পারিয়া, সে আরও দুইখানি সাড়ী কিনিল, তাহার একখানি ফিরোজা আর একখানি আসমানী রঙের। এইরূপ সওদা করিতে করিতে সে একদিন দেখিল তাহার ক্ষুদ্র তহবিলটি সমস্ত ফুরাইয়া গিয়াছে; এমন কি, তাহার নিজের কাপড় কিনিবার জন্য ও জলখাবারের জন্য যে টাকা ছিল—তাহা পর্য্যন্ত নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার দুইখানি কাপড় ও একখানি উড়ানী ছিল। একখানি কাপড় একেবারে জীর্ণ হইয়া অব্যবহার্য্য হইয়া গেল। অপর কাপড়খানি স্নান করিবার সময়ে সে কাচিয়া শুকাইতে দিত, ও চাদরখানি পরিয়া পুকুর-পাড়ে বসিয়া কাপড় শুকাইবার প্রতীক্ষা করিত। কোন দিন বৃষ্টি হইলে কাপড়খানি শুকাইত না, তখন বাধ্য হইয়া সেই ভিজা কাপড়খানিই সে পরিয়া থাকিত। এই সকল অনিয়মে তাহার দুই এক-

বার জ্বর হইয়া গেল—তাহার শরীর অত্যন্ত রোগা হইল। কিন্তু রাণী, নীলাম্বরী পরিয়া অন্ধকার মণ্ডিত কুন্দ কুসুমটির মত দেখাইবে—ফিরোজা সাড়ী পরিয়া পাতা-ঢাকা পদ্ম ফুলটির মত ফুটিয়া উঠিবে, লাল সাড়ীতে রক্তচন্দন মাখা শ্বেতাব্জটির মত দেখাইবে—এই ভাবিতে ভাবিতে তাহার দিন আনন্দে কাটিয়া যায়; সেই আনন্দে দৈহিক দুঃখ কষ্ট তাহার একেবারেই মনে হয় না। কখনও সে রাণীর সুকোমল করে কল্পনায় চুড়ী পরাইতেছে—একবার যেন মনে হইল—রাণীর হাতে লাগিয়াছে; তাহাতে সে "উহু" করিয়া উঠিল; অমনই নীলমাণিক বলিয়া উঠিল, "আহা, ব্যাথা পেয়েছ ?" সরল মিত্রের শিষ্যেরা বলিল—"বা! নীলা' তুই কি বক্‌ছিস্—কা'কে বল্‌ছিস্ ?" নীলা লজ্জায় মরিয়া গেল, কিন্তু কি বলিয়াছে, কাহাকে বলিয়াছে, প্রাণান্তেও সে বলিল না।

এ দিকে বাড়ীতে অন্নপূর্ণা যদিও মনে করিয়াছিল, রাণীকে কিছু বলিবে না, তথাপি তাহার ব্যবহার মোটেই

তাহার ভাল লাগিল না। একদিন কিন্তু চিন্তা বলিল, "আচ্ছা বউ, তোমার কেমন আক্কেল গা? যে লোকই এই বাড়ীতে ঢুকিবে, পায়ের শব্দ পাইয়া তুমি বেহায়ার মত তা'র দিকে ফিরে চাহিয়া থাক—তোমার আর ঘোমটার দরকার কি? গৃহস্থ ঘরের বউ, অপরের পায়ের শব্দ শুন্‌লে মাথা হেঁট করিয়া সরিয়া যাইবে, মুখ তুলিয়া চাওয়া কেন?" অন্নপূর্ণা বাধা দিয়া বলিল—"চিন্তা, খুঁটি-নাটিতে দোষ ধরিস্‌ না, যা' দোষ বলিয়া ধরিতে যাবি—সেগুলি আরও বাড়াইয়া তুল্‌বি।"

চিন্তা, বাল-বিধবা—সে সাধ্বী। কিন্তু তাহার দেহে রাগটি বিলক্ষণ আছে। সে স্বর উঁচু করিয়া বলিল, "কি জানি, মা, তোমরা নিজে বুঝিয়া সবটা চাপা রাখিতে চাও, কিন্তু আগুন ছাড়া পৃথিবীতে আরও অনেক জিনিষ আছে—যাহা চাপা পড়ে না, চাপা দিতে গেলে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে। বউএর রকম-সকম আমার মোটেই ভাল লাগে না। আচ্ছা, ও বাড়ীর বিপিন ছোঁড়াটার

কাঁচা বয়েস, সে টেরি কেমন করিয়া কাটে দেখ্‌লে আমার গা'টা জলে যায়। সে দিন পুকুরঘাটে বউ কলসী লইয়া জল আন্‌তে গিয়াছিল, আর ছোঁড়াটা ওপারে পা ধুইতেছিল—বউএর দিকে সবটা সময় তাকাইয়াছিল; বউ কোথায় তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে জল লইয়া আসিবে, না, সেইখানে কতকক্ষণ ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। একবার কলসীতে জল ভরে, একবার ফেলে—আমি ধনী মাসীর বাড়ী হইতে ফিরিবার পথে দেখে দেখে আস্‌ছিলাম;—রাগে আমার গা জলে যেতে লাগ্‌ল—তখন কিছু বলি নাই। গেল মঙ্গলবার রাত্রে নূতন খাতার দিন রামশরণ সাহার বাড়ীতে কবির গান শুনিতে আমরা সকলে গেলাম; কিন্তু দুপুর রাত্রে যখন ব্যাটারা খেউর গাহিতে আরম্ভ করিল, তখন আর আর বউ-ঝিয়েরা যা'র যা'র বাড়ী ফিরিতে পথ দেখ্‌তে পায় নাই, সব ছুট। কিন্তু তোমার বউটি সারারাত্রি ও সকাল ৯টা পর্য্যন্ত সেইখানে ঠায় বসেছিল। আমরা ভেবেছিলাম, সে পূর্ব্বেই

বাড়ী আসিয়া শুয়ে পড়েছে, পরদিন সকালে উঠ্‌তে আমাদের দেরি হোল, উঠে দেখি, বউ বাড়ী নাই, তার পর তাকে সেই খেউরের আসরের এক কোণ হ'তে লইয়া আসা হয়। আমি বলছি মা, এতে ঢাক্‌-ঢাক্‌ গুরু-গুরু নেই, এ বউকে লইয়া কপালে অনেক দুঃখ আছে।"

অন্নপূর্ণা আবার প্রতিবাদ করিয়া বলিল—"নে চিন্তা, ক্ষমা দে, তুই দেখ্‌চি, একটা সে দিনকার ছুঁড়ীকে একেবারে কৌশল্যা কি গান্ধারী ক'রে তুল্‌বি। ওর বয়স কি? এত হাঙ্গামা কেন? ওর আয়ৎ চিরকাল অক্ষয় থাকুক; আমার নীলার পুণ্যের জোরে ওর মাথার সিন্দুরের রঙে কোন কালেই কালী পড়্‌বে না।" রাগে গরগর করিয়া চিন্তা বলিল—"আচ্ছা, দেখা যাবে, মা। কুঁড়ি ফুলটা দেখ্‌লেও চিনি, কচি মাকাল ফলটা দেখ্‌লেও চিনি, কোন্‌টি কি হবে, তাহা সুরু থেকেই জানা যায়।"

এ সমস্ত বাদ-প্রতিবাদ রাণী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া

শুনিল; কিন্তু এগুলি যে তাহার সম্বন্ধে হইতেছে, তাহা মোটেই তাহার চেহারা দেখিয়া বোঝা গেল না। রজনী-গন্ধা ফুলটিও সান্ধ্য বাতাসে কাঁপিতে থাকে, কিন্তু এই নব-বধূটি ঝটিকার মত অভিযোগ খাইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। সে কয়েক দিনের মধ্যে তাহার স্বামীকে চিনিয়া লইয়াছে—সে যদিও আগন্তুক, তাহার শক্তি যে স্বামীটির উপর কত দুর্জ্জয়, তাহা তাহার বুঝিতে বাকী ছিল না। যিনি উদরে ধারণ করিয়া শেষে আজীবন মানুষ করিয়াছেন, কিংবা যিনি খেলার সঙ্গিনী হইয়া নীলুকে নানারূপ যত্নে বড় করিয়া তুলিয়াছেন—তাঁহারা কে? তাঁহারা কোন অজ্ঞাত জন্মের ঋণ হইতে মুক্তিলাভ-করিবার জন্য এই মমতা ও সেবা দিয়া তাহাকে পালন করিয়াছেন। সে বন্ধন প্রাচীন ও জীর্ণ, সৌন্দর্য্যের এই নূতন রজ্জু দিয়া বিপরীত দিকে টানিলে সেই জীর্ণবন্ধন ছিঁড়িতে কতক্ষণ লাগিবে? তাই দর্প ও অভিমানের গৌরবে দাঁড়াইয়া নীরবে রাণী তাহার বিরুদ্ধে সমস্ত

অভিযোগ শুনিল ও উহা দ্বারা সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইয়াছে, ইহা দেখাইতে ঘৃণা বোধ করিল।

৮

রাণীর বাপের বাড়ী নারাণপুর হইতে দুই ক্রোশ দূরে ছিল। সেখানে তাহার পিতা রূপলাল বৈষ্ণবের অবস্থা ভাল ছিল; কিন্তু তাহার স্বভাবটি ভাল ছিল না, সে নিত্য মদ্য পান করিত। আমডালা গ্রামটার নানারূপ অখ্যাতি ছিল। সেখানকার গৃহস্থ বৈষ্ণবেরা না করিতে পারিত, এমন দুষ্কর্ম্ম নাই। বৈষ্ণব ভিখারীগুলি "জয় চৈতন্য-নিত্যানন্দ" বলিয়া দিনের বেলা ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত ও গৃহস্থ-গৃহের সকল সন্ধান লইয়া রাত দুপুরে সিঁদ কাটিত। বয়স্ক ছেলেগুলি টেরি বাগাইয়া হারমোনিয়াম বাজাইয়া বিদ্যাসুন্দরের টপ্পা গাইত ও গৃহস্থের বৌ-ঝিয়ের প্রতি কুৎসিত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত। রাণী শ্বশুরবাড়ী আসার পর মাঝে মাঝে প্রায়ই বাপের বাড়ী চলিয়া আসিত। নীলু পাছে রাগ করে, এই ভয়ে অন্নপূর্ণা

কোনরূপ আপত্তি করিত না, কিন্তু চিন্তা বলিত, "এত ঘন ঘন বাপের বাড়ী যাওয়া কেন? সমস্ত মেয়ে, ঘর-গের-স্থালীতে ত মন বসা চাই।"

শ্বশুরবাড়ী রাণীর মোটেই ভাল লাগিত না। তাহার বাপের বাড়ীতে দিন-রাত আমোদ-উৎসব চলিত; সেখানে পূর্ব্বদিকের বড় বাঙ্গলা ঘরটাতে জগা, রেমো, হ'রে হার-মোনিয়ামের সঙ্গে সুর ভাঁজিত। রেমো ভ্রূদুটা যতদূর সম্ভব উঁচু দিকে টানিয়া লইয়া অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষে যখন তন্ময় হইয়া গাইত—"আমি সরমজড়িত চরণে কেমনে যাইব লোকের মাঝে", তখন খুব উচ্চৈঃস্বরে সঙ্গীরা দোহারী করিত। কেবলই 'বাহবা' 'তোফা' প্রভৃতি রব চারিদিক্ হইতে উঠিতে থাকিত; রাণী বিবাহের পর প্রথম যখন সে বাড়ী ফিরিয়া গেল, রেমো বলিয়া উঠিল, "কি রে রাণী, আমডাঙ্গা ছেড়ে গিয়া সেখানে মন টিক্‌ছে ত?" রেমো হচ্ছে রাণীর কাকার সম্বন্ধীর ছেলে; জগা হ'রে দুই জন পাড়ার ইয়ার, তাহাদের সঙ্গে রাণীর তেমন কোন সম্বন্ধ

নাই। জগা বলিল, "বাঃ রাণী এরই মধ্যে যে তুই মাথায় বেড়ে উঠেছিস্, চেহারা একবারে বদ্‌লে গেছে, তোকে কয়েকটা গান শিখাব মনে করেছিলাম, এখন আর সে প্রস্তাব করিতে ভরসা হয় না।" এমন সময়ে হ'রে দাঁড়াইয়া রেমোর দিকে মুখ ফিরাইয়া ওস্তাদি ধরণে গাহিতে লাগিল, "দরশন বিনে আমার প্রাণ যে যায়," রেমো হারমোনিয়া বাজান ক্ষান্ত করিয়া হ'রেকে বলিল, "পাহাড়ী রাগিণীটা একবারে মাটি কল্লি!" এই বলিয়া হ'রের মুখ হইতে আধখানা গান কাড়িয়া লইয়া "প্রাণ যে যায়" কথাটা মিহি সুরে টানিয়া গাহিয়া এরূপ সুরের উৎপত্তি করিল যে, সকলে হাসিয়া ফেলিল। রাণীর মুখেও মৃদুহাস্য ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই অপ্রতিভ হইয়া সে সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, জগা বলিল, "থাক না রাণী একটুকু, নারাণপুরের রান্নাঘরের ধোঁয়া গিল্‌বি ও গোয়ালের ঘুঁটে কুড়ুবি, তখন আমাদের এই গান শোনবার জন্য মনের ভিতর হাহাকার হবে।" রেমো বলিল,

একটুখানি মেয়েকে নিয়ে ইয়ারকি ঠুক্‌ছিস্—যা, তোরা বড় খারাপ হচ্ছিস্, বেশ বড় তালে ভাল গান গা না।” এই বলিয়া দুই হাতে টেরিটা বাগাইয়া লইয়া তবলাতে চৌতাল ঠুকিয়া সে গাহিতে লাগিল। “দয়ার যার নাহিক বিরাম, ঝরে অবিরত ধারে।” জগা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, “আহা! কি দয়া! আমার তবলাটাতে এমনই জোরে ঘা মার্‌ছিস, ওর চামড়াটা ছিঁড়ে ফেল্‌বি দেখ্‌ছি—দে, তবলাটা আমার হাতে দে”—তবলাটা কাড়িয়া লইয়া সে মনোহরসাহী রাগিণী আলাপ করিয়া গাহিতে লাগিল :—

“ছিল প্রেম-বিবাদিনী, পাপ ননদিনী, সে যে কুম্ভিরিণীর মত ফিরত”—তাহার কণ্ঠটা ছিল করুণ—সে এমনই স্বরে গাহিল যে, চিন্তাদিদির অত্যাচার মনে পড়িয়া রাণীর চোখে এক ফোঁটা জল দেখা দিল।

কয়েক দিন বাপের বাড়ীতে কাটাইয়া রাণীকে আবার নারাণপুরে আসিতে হইল। তখন তাহার গৃহকর্ম্ম—শাশুড়ীর আদর সমস্তই বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল।

জগা নূপুর পায় হীরামালিনী সাজিয়া নাচিয়া নাচিয়া "ওই দেখা যায় বাড়ী আমার চৌদিকে মালঞ্চ ঘেরা। আমার এ ফুল বাগানে কভু নয় বসন্ত ছাড়া।" গানটি গাহিত, তাহা শুনিবার জন্ম তাহার চিত্ত ব্যাকুল হইল, এবং সেই তরুণ গায়কের করুণ কণ্ঠের "ছিল প্রেম-বিবাদিনী পাপ ননদিনী" গানের রেশ্‌টা তাহার মনের মধ্যে নিরবধি ঝঙ্কৃত হইত।

নীলমাণিকের প্রেম রাণীর পাওনা-গণ্ডা। ফুলের গন্ধ যেরূপ আসে, হাওয়া যেরূপ আসে—ইহা সেইরূপ—ইহা ত সে পাইবেই। ইহা কেহ খোঁজে না—অমনই পায়। যাহা অমনি পাওয়া যায়, তার আর মূল্য কি—হো'ক না তাহা পর্ব্বত-প্রমাণ। কিন্তু যাহা তাহার আয়ত্তে নাই তাহাতেই সে ভুলিল। সে মাঝে মাঝে তাহার পিত্রালয়ের নাচ-গান ও পরিহাস-রসিকতার মধ্যে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। এখানে রাধাবল্লভের নিত্য সেবায় ফুল-চন্দন-মিশ্রিত নিষ্ঠাপূর্ণ দেব-উপহার রচনায় সে আমোদ

কোথায় ? বরং চিন্তার নিত্যকার কুটিল মন্তব্য ও উপদেশ শুনিয়া তাহার আত্মা কাহিল হইয়া পড়িয়াছিল এবং শ্বশুরবাড়ী হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্ত তাহার মন ত্রাহি ত্রাহি করিতেছিল।

এ দিকে চিন্তা আরও নানাভাবে রাণীকে বিরক্ত করিতে লাগিল। বালবিধবারা অনেক সময় মনে করে, তাহাদের দুর্ভাগ্য সকলই আচার-লঙ্ঘনের দরুণ। কোনও রূপ আঁসের সম্পর্কে আসিলে তাহাদের পরকাল একবারেই নষ্ট হয়, ইহাই অনেকের বিশ্বাস। চিন্তার এগুলি রোগে দাঁড়াইয়াছিল। কখনও একটা মাছের কাঁটা বিড়ালে লইয়া যদি তাহার রান্নাঘরের নিকট ফেলিয়াছে, তখনই সে সমস্ত বাড়ীময় গোবর-জল লেপিতে লেপিতে রাগে গর-গর করিয়া বকিতে লাগিয়াছে। সে এবং রাণী এক ঘরে শুইত—কিন্তু রাণীর মশারির দড়ি যদি তাহার মশারিতে ঠেকিত, তবে সে রাত্রে যাইয়া তাহার মশারি ধুইয়া আনিত। আঁস-খেকো অনাচারী লোকের এতটুকু

স্পর্শ সে সন্ধ্যার পর হইতে সুরু করিত না—কারণ, সে অর্দ্ধেক রাত্রি পর্য্যন্ত জপ করে। দিনের বেলায় যে সকল পিপীলিকা আঁদের রান্নাঘর হইতে ইতস্ততঃ গতিবিধি করে, তাহারা তাহার হবিষ্যঘরে ঢোকে কি না এবং রান্নাঘর হইতে ফিরিবার পথে সেই সকল দুর্দ্দান্ত পিপীলিকারা তাহার তিলক সেবার মাটীতে—তাহার শয়ন কক্ষের নিকট গোময়-লিপ্ত তুলসী-মঞ্চ প্রভৃতি পবিত্র স্থানে—অশুদ্ধ দেহে আনাগোনা করে কি না—ইহাই দেখিবার ও সেই বিপদ্ ঠেকাইবার জন্য সে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকে; পাড়ার তিন বছরের একটা ছেলে বাসি কাপড় লইয়া তাহাকে ছুঁইয়া গেল, সে গালি দিতে দিতে তখনই পুকুরে নামিল। সাত বৎসরের আর একটা ছেলে ঠাট্টা করিয়া বলিল—"চিন্তা দিদি, পুকুরে যে মাছ আছে! জলের মধ্যে ঢোক গিলিলে যে মাছের ঝোল পেটের মধ্যে যায়!" চিন্তা উপরে উঠিয়া একটা কঞ্চি লইয়া সে ছেলেকে তাড়া করিয়া ছুটিল। এইভাবে

দিনরাত্র জলে ধুইয়া ধুইয়া তাহার দেহ, শয়ন-ঘর ও হবিষ্যঘরকে সে একরূপ জলচরে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার বিশ্বাস, পূর্ব্বজন্মে এই সকল অনাচার করার ফলেই তাহার বৈধব্য। এজন্মে আবার অপরাধী হইলে জন্মান্তরে তাহার এই দুর্গতি হইবে।

এই সকল আচার-নিষ্ঠাজনিত অত্যাচারের অনেকটাই পড়িত রাণীর উপর। "ও বউ, দেখ দেখি, তোমার কেমন আক্কেল! রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া তুমি তোমার আঁচলটা আমার গায়ে ঠেকাইয়া গেলে! এখন এই স্নান ক'রে এসেছি, আবার জলে গিয়া পড়ি।" "ও বউ, দেখ দেখি, আঁস কাটবার বঁটিটা উঠানে ফেলে রেখেছ, আঁধারে তাহার বঁটটা আমার পায়ে লেগে গেল"—এই ভাবে খুঁটি-নাটি ধরিয়া দিনরাত্র রাণীর উপর ভৎর্সনা হয়। আবার চিন্তা প্রায়ই উপবাস করে;—আজ একাদশী কিংবা চতুর্দ্দশী, দুই দিন না যেতে যেতেই অমাবস্যা বা পূর্ণিমা, তা' ছাড়া আজ

মঙ্গলবার, আজ অমুক প্রভুর তিরোধান—এইভাবে পঞ্জিকার পত্রে পত্রে উপবাসের দিন। চিন্তা ইহার সমস্ত পালন করে, এবং যে সকল দিন উপবাস করে, সেই সকল দিন তাহার মেজাজটি বারুদের মত হইয়া থাকে, সামান্য কারণে তাহা জ্বলিয়া উঠে। রাণীর উপরেই সেই রাগের ঝাঁজ বেশী হয়,—কারণ রাণী সাধারণ গৃহস্থের বউঝি অপেক্ষা আচার সম্বন্ধে অনেকটা বেশী শিথিল, ইহা তাহার বাপের বাড়ীর শিক্ষার ফল। অন্নপূর্ণা একদিন গোপনে বলিল, "বউ, কি কর্ব্বে? বাল-বিধবা, উহার মেজাজ স্বভাবতঃই একটু তিরিক্ষি, একটু সহিয়া থেক; ওর মত অভাগী সংসারে কে আছে! কত খরচপত্র করিয়া রাজার মত বড় ঘরে বিবাহ দিয়েছিলাম, তা' সিঁথির সিন্দুর মোছার সঙ্গে সঙ্গে সব সুখ হইতে বঞ্চিত হ'য়ে আছে।"

কিন্তু রাণী মনে মনে চিন্তার একটি ব্যবহারও ক্ষমা করে নাই। তাহার ত মায়ের প্রাণ নয়! সে আসিয়াছে সেই গৃহে পূজা লইতে, কাহাকেও ক্ষমা করিতে আসে

নাই। সৌন্দর্য্যের বেদীতে দাঁড়াইয়া নব-যৌবনের গর্ব্বে সে এই ঘরকন্নাকে একটা পর্ব্বতাকার জঞ্জাল মনে করিতে লাগিল। শক্তি থাকিলে সে এখনই তাহা পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া উধাও হইয়া সেই উৎসবের মধ্যে যাইয়া পড়িবে—যেখানে স্মিতমুখে জগা হারমোনিয়ামের সঙ্গে গাহিবে—"ও ধনি মানিনি, মান নিবার" এবং রেমো উত্তেজিত-কণ্ঠে বলিবে, "চল ভাই, আমরা পাখী হইয়া আমোদের আকাশে একেবারে উ'ড়ে চ'লে যাই।"

৯

এবার যখন নীলমাণিক বাড়ীতে আসিল,—সে রাণীর একটা আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। সে সাড়ী, সাবান ও চুড়ীগুলি লইয়া রাত্রে ঠিক পূজারির ন্যায় প্রীতির সহিত রাণীকে দিতে গেল; রাণী কুটিল হাসিতে অধর বক্র করিয়া নিতান্ত উপেক্ষার সহিত সেগুলি রাখিয়া দিল। যে মধুর হাসিটুকু দেখিবার জন্ত ক্ষুধা সহিয়া, ছিন্ন বাস

পরিয়া সেগুলি সংগ্রহ করিয়াছে, সেই তাহার বড় সাধনার হাসিটুকু সে দেখিতে পাইল না। সে নানারূপ গল্প জুড়িয়া দিয়া দেখিল—রাণীর তাহা শুনিতে কোন উৎসাহই নাই। সে যে শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে—গ্রামের যে কেহ তাহাকে দেখিয়াছে, সেই সে বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে। অন্নপূর্ণা তাহার ভগ্ন শরীর দেখিয়া সারাদিন কাঁদিয়াছে,—এখনও তাহার চোখের জল শুকায় নাই। সে সম্বন্ধে রাণী একটা কথা বলিল না। সে কেমন ছিল, একটিবার জিজ্ঞাসা করিল না,—সংসর্পিত বেণী পৃষ্ঠে দোলাইয়া নিতান্ত অসংশ্লিষ্ট দর্শকের ন্যায় নীলমাণিকের শত আদর উপেক্ষা করিল। মোট কথা, চিন্তার ব্যবহারে রাণী মনে মনে রাগিয়া গিয়াছিল। তাহার সমস্ত রাগ স্বামীর উপর হইয়াছিল। কেন সে তাহাকে বিবাহ করিয়া তাহার পিতৃগৃহের উৎসব-উদ্যান হইতে তাহাকে তুলিয়া আনিয়াছে? সে আকাশের মুক্ত পাখী—আমোদ-আহ্লাদের স্বর্গে উড়িয়া বেড়াইত—কে তাহাকে

শ্বশুরালয়ের পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়াছে ? স্বামীর অগাধ প্রেম বুঝিবার তাহার শক্তিই ছিল না। আঁচলের হীরা ফেলিয়া যেরূপ কোন অবোধ ব্যক্তি ঘষা পয়সার লোভ করে—রাণী সেই ভাবে পিতৃগৃহের আমোদের জন্য লালায়িত হইয়াছিল।

অনেকক্ষণ পরে রাণী ঘুমাইয়া পড়িল। তখন নীলমাণিক তাহার ক্ষীণ করতল দ্বারা রাণীর পা' স্পর্শ করিল, তাহার চক্ষে শায়ণের ধারার ন্যায় জল ছাপাইয়া উঠিল। "আমি কি অপরাধ করিয়াছি রাণী, তুমি আমার সঙ্গে কথা কহিলে না ? তোমার কথা আমার মনোহরসাই কীর্ত্তন,—আমি এই ছয় মাস ভরিয়া সেই মধুমাখা কথা শুনিব বলিয়া ধ্যান করিয়াছি। রাণী, দেখ, আমার শরীর শুকাইয়া গিয়াছে—ময়নাডাঙ্গায় নিত্য রাত্রে আমি তোমাকে স্বপ্নে দেখিয়া কাঁদিয়াছি।" বহুক্ষণ নীলমাণিক সুপ্তা রাণীর পদতলে বসিয়া কাঁদিল—কতবার ধীরে ধীরে তার আলতাপরা পা' দুখানি ছুঁইল—একবার অতি

আগ্রহে সেই সুন্দর পা' দুখানি নিজের বুকে আস্তে ঠেকাইল,—তারপর পাছে রাণীর ঘুম ভাঙ্গে, এই ভয়ে খাটের নীচে আসিয়া মাটীতে শুইয়া কাঁদিতে লাগিল ; মনে করিল, যদি রাণীর ঘুম ভাঙ্গে, হয় ত নীচে নামিয়া সে তাহার তপ্ত বক্ষ কোমল হাত দু'খানিতে ছুঁইয়া শীতল করিবে। অশ্রু-জড়িত চক্ষে ঘুমের ঘোরে সে স্বপ্ন দেখিল—রাণী তাহাকে আদরে আলিঙ্গন করিয়াছে। তখন আনন্দে চক্ষুজল পড়িয়া তাহার কণ্ঠরোধ হইল—কিন্তু সে জাগিয়া দেখিল, রাণী আসে নাই,—তাহার বাসর ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। কালো পুকুরের পাড় হইতে একটা কোকিল ডাকিয়া তাহাকে জাগাইয়া দিল। আর তাহার রাণীকে চূড়ী পরাণ হইল না ; নীল, লাল, ফিরোজা, গোলাপী ও আসমানী কোন্ সাড়ীতে তাহাকে বেশী মানায়—তাহা পরীক্ষার সুযোগ চলিয়া গেল।

নীলমাণিক কেবল মায়ের সঙ্গেই আবদার করিত—সে অপরাপর সকলের নিকট বড় লাজুক ছিল। সে

প্রাতঃকালে একটি অনিন্দ্য কুসুমহারের ন্যায় সুপ্তা সুন্দরীকে বিছানায় রাখিয়া, তাহাকে সুস্থ রাখিবার জন্য ঈশ্বরকে প্রার্থনা করিয়া ধীরে ধীরে শয্যা-গৃহ ত্যাগ করিল। কয়েক দিনের মধ্যে সে বুঝিল, রাণীর প্রতি চিন্তার ব্যবহার ভাল নহে। রাণী নিজে স্বামীকে কিছু বলে নাই; চিন্তার মুক্ত-রসনা প্রত্যেক খুঁটি-নাটির তত্ত্ব শত-ধারায় তাহার কর্ণে পৌঁছাইয়া দিতে বিলম্ব করে নাই। চিন্তা ভাবিয়াছিল, রাণীর দোষগুলি সে নিজে যেরূপ জলবৎ প্রত্যক্ষ করিতেছে, তাহার এত সোহাগের নীলমাণিকও তাহা সেইরূপ বুঝিবে, কিন্তু ফল উল্টা হইল। নীলমাণিক চিন্তার সঙ্গে কথা বন্ধ করিয়া দিল, এবং মায়ের ও এই ব্যাপারে কিছু যোগ আছে সন্দেহ করিয়া খুঁটি-নাটি ধরিয়া তাহার সঙ্গে ঝগড়া করিতে লাগিল।

এ দিকে অন্নপূর্ণা দেখিত, বউ তাহার বড় সাধের নীলাকে একেবারেই অগ্রাহ্য করে। একদিন নীলা জল খাইতে চাহিল, বউ একটা সাত-বাসি, ময়লা, দাগ-পড়া

ঘটির অর্দ্ধেকখানি জলে ভরিয়া স্বামীর কাছে ধপাৎ করিয়া ফেলিয়া চলিয়া গেল। অন্নপূর্ণা না বলিয়া পারিল না—"আচ্ছা, বউমা, এমন ঘটিতে আমাদের চাকর-বাকরেরা জল খাইতে ঘেন্না করে, তুমি নীলাকে ইহাতে জল খাইতে দিলে!"

নীলমাণিক তাড়াতাড়ি সেই ঘটির জল খাইয়া মাকে বলিল—"না,মা, ঘটিটার উপরটা দেখ্‌তে ময়লা, ভিতরটা বেশ পরিষ্কার।" অন্নপূর্ণা দুঃখিত-চিত্তে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া গেল। অন্নপূর্ণা দেখিত—নীলু নিজের বিছানা নিজে পরিষ্কার করে,—উহার ভার বউএর উপর, কিন্তু বউ সেইখানে বসিয়া জানেলার দিকে ঝুঁকিয়া শিউলি-গাছের ফুল দেখে, কাকের দিকে ঢিল ছোঁড়ে—পানের বোঁটা ভাঙ্গে, কিন্তু একটিবারও নীলার সাহায্য করে না। কিছু বলিলে নীলা আসিয়া বাধা দেয়—বলে—"মা, বউই ত সব করে, আজ আমি উহাকে নিষেধ করেছি।" বউএর খাওয়ার জন্য নীলা নেংড়া-গাছের ডাল

আমগুলি পাড়িয়া রাখে। একদিন তাহাদের সরকার রামজীবন বলিল, "নীলু, ওই ভাল ফলগুলি দিয়া অধিকারী মহাশয় রাধাবল্লভের ভোগ দেবেন বলেছিলেন, এগুলি পাড়ছেন কেন?" নীলমাণিক হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমিও দেব-ভোগের জন্যই পাড়ছি।" দুঃখের বিষয় এই যে, পাথরের দেবতা যেরূপ নানা ভোগ পাইয়া একটি মৃদু-হাস্য কিংবা একটা মুখের কথা দিয়া ভক্তকে প্রসন্ন করেন না,—রাণীও স্বামীর উপহৃত কুসুমদাম ও ফল-ভোগ পাইয়া তেমনই নিষ্ঠুরভাবে উপেক্ষা করে,—কখনও মাত্র বলে, "এ সমস্ত ছাই-ভস্মের জন্য পরিশ্রম করিবার কি দরকার ছিল?" হায়! ছাই-ভস্ম! সমস্ত প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়া যে দেবতার নৈবেদ্য তৈয়ার করা হয়, তাহা তাহার নিকট ছাই-ভস্ম!

নীলমাণিক আহারে ব্যবহারে উদাসীন হইল। সে সেবা করে, কিন্তু সেবা বিফল হইয়া গেল। সে বীতস্পৃহ যোগীর ন্যায় সংসারের কোন সুখের প্রতি লোভ

করে না, তাহার নিকট তাহার জীবন-মরণের তুল্য-মূল্য। হায় হতভাগ্য! তোমাকে একটি দিন সুখে রাখিবার জন্য যিনি হাসিমুখে প্রাণ দিতে পারেন, এমন মা অন্নপূর্ণা তোমার ঘরে স্নেহের ভিখারী, তুমি তাঁহার প্রতি উদাসীন হইয়া গিয়াছ। যৌবন যাহা চায়, তাহা না পাইয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছ! কিন্তু তোমার দেবদত্ত স্নেহের ঘট যে গৃহে স্থাপিত আছে—তাহাতে অর্ঘ্য দেওয়া ভুলিয়া গিয়াছ!

একদিন চিন্তা তাহার মাকে বলিল, "দেখ্‌চ বউ-এর কাণ্ড! বাঁশতলায় একটা উনুন করিয়া বেণী খুলিয়া ফেলিয়া চুলগুলি ফুলাইয়া বেঁধেছে, এবং কি একটা রান্নার ছল করিয়া, বাপের বাড়ী থেকে জগা না কে এসেছে—তার সঙ্গে দুই ঘণ্টা ধরিয়া বিড়-বিড় ক'রে কি বকৃছে; ছোঁড়াটার চেহারা দেখ্‌লে হাড় চটে যায়, একটা রং-বিরঙের কুর্ত্তি গায় ও মাথা-জোড়া চুল পাতা করিয়া কাটা, বাঁ দিকে টেরী—এর স্বভাব নিশ্চয়ই ভাল নয়, এর সঙ্গে এত কি কথা থাকৃতে পারে?"

অন্নপূর্ণা দুঃখের স্বরে বলিল,—"থা'ক, ও সকল কথার মধ্যে তোর থেকে দরকার নাই।" "থেকে দরকার নাই কেন মা? ছেলেটার কপালে যে কি দুর্গতি আছে, তাহা শেষে টের পাবে।" অন্নপূর্ণা বলিল, "কি কর্ব্ব? যে দিন রাধাবল্লভ ওর ঘটে বুদ্ধি দেবেন, সে দিন ও নিজে বুঝ্‌বে। পরকে বুঝান বড় শক্ত—বৃথা চেষ্টা তুই করিস্‌ নে। নীলু যদি এ সকল ভাল বোঝে, এমন স্ত্রীকে লইয়া যদি সুখে ঘর করে, তবে খোঁচাইয়া সন্দেহ সৃষ্টি কর্‌বার আমরা কে? আমাদের গৃহস্থালী এক রকম ছিল—এখন চারিদিকেই নূতন হাওয়া বইছে—সে নূতন তোর আমার ভাল না লাগ্‌লেও যদি নূতনদের ভাল লাগে—তবে আমরা ঝগড়া করতে যাই কেন?"

চিন্তা।—যে'টা মন্দ, তা' সকল সময়েই মন্দ, যা' ভাল, তা' চিরকালই ভাল—এর আবার সেকাল একাল কি? নীলা ত একটা গাধা নয়। ওর একদিন চোখ ফুট্‌বে, তখন চারিদিক্ আঁধার দেখ্‌বে; আর

আমাদের কি উচিত যে, আমরা চোখ বুজে থাকি এবং দূরে ব'সে তামাসা দেখি ?"

"কি কর্‌ব চিন্তা, আমি রাধাবল্লভকে কত বল্লাম, আমার নীলুর বুদ্ধি ভাল ক'রে দাও, বউএর বুদ্ধি ভাল ক'রে দাও—কই, তিনি শুন্‌লেন কই ? আমি লক্ষ নাম জপ কর্‌লাম, কই, তিনি ত ওদের ঘটে বুদ্ধি দিতেছেন না। ওঁকে বল্লাম, 'কি করা যায় ?' তিনি বল্লেন—'ছোট কথা ঘাঁটিয়া বড় করিয়া তু'ল না। যে যেমন কাজ ক'রে এসেছে, সে তার ফল ভোগ কর্‌বে—আমাদের কি সাধ্য ঠেকাইয়া রাখি। তোমাকে পূর্ব্বেই ব'লেছিলাম, রাধাবল্লভের সেবা ছেড়ে দিয়ে তুমি নীলুর সেবায় মন দিয়েছ—তুমি কষ্ট পাবে। তাঁর সেবা বাদ দিয়া যাকে লয়ে ব্যস্ত হবে, সে ছেলেই হোক, স্বামীই হোক—তার হাতে কপালে কষ্ট লেখা আছে।' যা'ক, বউকে কিছু ব'ল না চিন্তা। নীলু শুনিলে ভারি চটে যাবে।"

"নীলু কি শুনিলে চটে যাবে, মা ?" বলিতে বলিতে

নীলু ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল—"বউএর নিন্দা হচ্ছে বুঝি ? এইটাই ত তোমাদের মস্ত কাজ। আজ বউ বাঁশ-তলায় ব'সে রাঁধ্‌ছে, বাঁশ-বন রূপে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বাপের বাড়ীর লোক এসেছে, বউএর আজ ভারি স্ফূর্ত্তি—তোমাদের সহ্য হচ্ছে না; এ রকমটি ক'রে তোমরা বউএর মেজাজ খারাপ ক'রে দিয়েছ।"

চিন্তা অনেক দিন নীলুর সঙ্গে কথা বলে নাই; আজ থাকিতে পারিল না, ঝঙ্কার করিয়া বলিয়া উঠিল—"তুই তোর রূপসীকে লইয়া সুখে থাক্—আমরা তাহার মেজাজ খারাপ কর্‌ব না। বুড় শিবুঠাকুর তার স্ত্রীকে লইয়া কাশীবাস কর্‌তে যাচ্ছে, কা'ল সকালে আমি তাদের সঙ্গে কাশী চল্লুম। তোদের সুখের পথে আমার কাঁটা হইয়া থাকার কোন দরকার নেই।"

পরদিন সত্য সত্যই পিতামাতার শত শত অনুরোধ উপরোধ এড়াইয়া চিন্তা কাশীযাত্রা করিল। তাহার স্বামি-দত্ত সম্বল ছিল। এ পর্য্যন্ত পিতামাতার

সেবার জন্য এবং বড় সোহাগের নীলুর মায়ায় সেই সংসারে আবদ্ধ ছিল, আর রহিল না।

যখন চিন্তা চলিয়া যায়, তখন নীলমাণিক দাঁড়াইয়া দেখিল, সাশ্রু চক্ষে সে পিতামাতার পায়ে গড় করিতেছে, তাঁহারা উভয়েই অধোমুখে বসিয়া কাঁদিতেছেন। সহসা চিন্তা বামদিকে একটু অগ্রসর হইয়া নীলার হাত দুখানি চাপিয়া ধরিল এবং বলিল, "ভাই! আমি চল্লাম, আর দেখা হইবে কি না, জানি না। তুই আমাকে চাহিলি না, আমার প্রাণে তুই চিরদিনই থাকৃবি। তোর চাঁদ-মুখখানি দেখে আমি সংসারের সকল জ্বালা জুড়ায়েছি, তাহা আমি কিছুতেই ভুল্‌তে পার্‌ব না।" এই বলিয়া আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে চিন্তা বুড় শিবুঠাকুরের সঙ্গে নৌকায় আরোহণ করিল। নীলমাণিক সেইখানে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শীতের রাত্রে আগুনের পার্শ্বে বসিয়া সুমধুর স্বরে সেই রামায়ণ-পাঠ আজ শেষ হইয়া গেল। বাদলার দিনে মুক্তালতার পার্শ্বে কৃষ্ণছায়া হইয়া

রাধা যে বিলাপ করিয়াছিলেন—তাহা পড়িতে পড়িতে দিদি কাঁদিত—ভাই-বোন একত্র হইয়া কাঁদিত—কখনও মধ্যরাত্রে গান্ধারীর কুরুক্ষেত্র-দর্শন প্রসঙ্গে "মহাভয় উপজিল দেখি রণস্থল" প্রভৃতি পড়িতে পড়িতে চিন্তার স্বর কম্পিত হইত এবং নীলা ভয়ে শিহরিয়া উঠিত—সেই সুখ-দুঃখ-ভয়-মিশ্র রাত্রির কত কথার উপর আজ যবনিকা পড়িল। বহু দিন গত হইল, নীলমাণিকের বয়স যখন আট, তাহাকে পার্শ্বে শোয়াইয়া চিন্তা মৃদু-মধুর স্বরে গাহিত—"রজনী শাঙন ঘন—ঘন দেওয়া গরজন—রিমি ঝিমি শবদে বরিষে,"—সেই গানের সঙ্গে কত রাত্রের মেঘ, বায়ু ও বৃষ্টি যেন একত্র হইয়া গাহিত। শৈশব ও সুখ-কৈশোরের অনেক স্মৃতি, অনেক ইতিহাস আজ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে নারাণপুর ছাড়িয়া চলিল। বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া নীলমাণিক সেই সকল কথা ভাবিতে লাগিল—তাহার চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু পড়িতে লাগিল।

নীলমাণিক

ভগবান্ অধিকারী ইদানীং বাতরোগে কষ্ট পাইতেছিল—সে আর কীর্ত্তন গাহিতে কোথায়ও যাইতে পারিত না; বিছানায় শুইয়া থাকিত এবং কখনও কখনও অপরের সাহায্যে উঠিয়া রাধাবল্লভের দরজার কাছে বসিয়া জপ করিতে চেষ্টা করিত। নীলমাণিকের স্ত্রী ঠিক মনের মতন হয় নাই, সে শুধু চেহারা দেখিয়া তাহাকে পছন্দ করিয়াছিল। কিন্তু শেষে তাহার ব্যবহার এবং তাহার পিতৃগৃহের ব্যাপার জানিয়া অধিকারী বিষম মনঃকষ্ট পাইয়াছিল। এই মনঃকষ্ট তাহাকে অনেকটা অকাল-মৃত্যুর দিকে টানিয়া আনিয়াছিল, কিন্তু সংসারে সে রাধাবল্লভের দোহাই দিয়া অনেকটা নির্লিপ্ত-ভাবেই থাকিতে চেষ্টা করিত। সে তাহার মনের কথা আর কাহাকেও বলে নাই, বরং অন্নপূর্ণা এই সকল কথা তাহার কানে তুলিলে, "বউএর বয়স কি ? তাহার বাপ-

মায়ের কথায় আমাদের থাক্‌বার দরকার কি ?" প্রভৃতি-রূপ বাক্যে তাহাকে নিরস্ত করিত। এই ভাবে একদিন তাহার দেহাবসান হইল। তখন শ্যাম-সন্ধ্যা আকাশ হইতে নামিয়া অধিকারীর বাগানের গাছগুলি যেন নীল-আঁচলে ঘেরিয়া লইয়াছে—সেই নীল বসনে খদ্যোতগুলি স্বর্ণ-বিন্দুর মত জ্বলিতেছে। কালো পুকুরের জলে যেন সন্ধ্যার শীতল বক্ষ বিস্তারিত হইয়াছে, ও তাহার স্নিগ্ধ দুটি চক্ষু জল-স্থলের সর্ব্বত্র অপার করুণায় দুঃখার্ত্ত শত শত নরনারীর দিকে মায়ের চক্ষুর ন্যায় ন্যস্ত রহিয়াছে। এই সময় ভগবান্ অধিকারীর শেষ নিশ্বাস পড়িয়া গেল। তাহার অর্দ্ধোচ্চারিত শেষ কথা—'রাধাবল্লভ।' জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে অধিকারী তাহার ঠাকুরকে খুঁজিতেছিল। সেই নিঃসঙ্গ দুর্জ্ঞেয় পথের আর কোন সাথী নাই—ইহ-কালের অপর পারের সমুদ্র-যাত্রায় তিনি ভিন্ন নাবিক আর কে আছেন ?

তখন মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব কীর্ত্ত-

নীয়ারা শব স্কন্ধে করিয়া কানাই নদের দিকে লইয়া চলিল। পিতৃহীন নীলমাণিক চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে সেই শবের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। কীর্ত্তনীয়ারা খোলের সঙ্গে গাহিয়া চলিল ;—

"গৌর চল্ল ব্রজ-নগরে।
ছেঁড়া কাঁথা মুড় মাথা করঙ্ক লয়ে করে।"

সমস্ত ঐশ্বর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া ভিখারীর বেশে মানুষ কোন্ লোকের অভিসারে যাত্রা করে, নীলমাণিক তাহাই ভাবিতে লাগিল।

পিতৃশ্রাদ্ধ শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই অধিকারীর বাড়ীতে আর এক বিপদ্ ঘটিল। হঠাৎ একদিন প্রাতে দেখা গেল, রাণী বাড়ীতে নাই ; গ্রামের সমস্ত বাড়ী খুঁজিয়া তাহাকে পাওয়া গেল না। জেলে আনিয়া পুকুর ও ডোবা খোঁজা হইল—কোথায়ও নাই। আমডালায় লোক পাঠান হইল, বউ সেখানেও যায় নাই। নীলমাণিক সারারাত্রি জাগিয়া রাণীর পার্শ্বে বসিয়া থাকিত, রাণী

ঘুমায়—নীলা বাতাস করে। কথনও সে বাগানের ফুল সন্ধ্যাকালে তুলিয়া রাখে, রাতে তাহা দিয়া মালা ও মুকুট প্রস্তুত করে—ধীরে ধীরে—ঘুম না ভাঙ্গে, এই ভাবে তাহার জীবন্ত প্রতিমাকে সেই মুকুট ও মালা পরাইয়া দেখে। কথনও সে পশ্চিম বা পূবের জানালা খুলিয়া দেয়, চন্দ্ররশ্মি ধীরে ধীরে রাণীর মুখখানির উপর আসিয়া পড়ে। এত আদর ও সোহাগের রাণী তাহাকে এতটা উপেক্ষা করে —মনে হইলে কথনও তাহার চক্ষে জল আসে। এই ভাবে সুখে দুঃখে সে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটায়। বর্ণিত রাত্রে প্রায় সারারাত্রি কাটাইয়া প্রভাতের কিছু পূর্ব্ব হইতে নীলমাণিক একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু সেই রাত্রে তাহার অভ্যাসের বিপরীত—রাণী দুই তিনবার জাগিয়াছে, এবং নীলমাণিককে বলিয়াছে, 'ঘুমিয়ে পড়—সারারাত্রি জেগে থেকে অসুখ করবে।' নীলমাণিক দেখিল, রাণীর ভাল ঘুম হয় নাই—সে বারংবার এ পাশ ও পাশ ফিরিয়াছে—রাত্রি কতটা আছে, নীলমাণিককে দুইবার

জিজ্ঞাসা করিয়াছে; এমন কি, জীবনে যে পাঠ কখনও হয় নাই, নীলাকে ঘুম পাড়াইবার জন্য মধ্যরাত্রের পর রাণী নিজে পাখা লইয়া হাওয়া করিয়াছে। এই অসম্ভব ব্যাপারে নীলা তাহার কোমল হস্তে ব্যথা সহিবার অক্ষমতার উল্লেখ করিয়া তাহাকে অনেকবার নিষেধ করিয়াছে, রাণী তাহা শোনে নাই। একবার যেন নীলমাণিকের মনে হইল, রাণীর গা'টা একটু গরম—কিন্তু রাণী বলিয়া উঠিল, "অসুখ টসুখ কিছু হয় নাই, তুমি ঘুমও।" শেষ রাত্রে দুই ঘণ্টা ঘুমাইবার পর যখন তাহাদের বাগানের আম্রবৃক্ষের ডালে কোকিল দিগ্‌দিগন্ত মাতাইয়া ডাকিয়া উঠিল—সেই সময় নীলার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং সে দেখিল, রাণী শয্যায় নাই।

তার পর সারাদিন চেষ্টা করিয়া রাণীর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। তাহার বাপের বাড়ীর লোকেরাও এদিক্ ওদিক্ খুঁজিয়া শেষে জানাইল, প্রায় দশ বারখানা গ্রাম খুঁজিয়া তাহার কোন সংবাদ পায় নাই।

নারাণপুরের একটা লোক বলিল, "পূর্ব্বের দিন সন্ধ্যাবেলা একটা ছোঁড়া—তাহার মাথার চুল পাতা-কাটা, রং-বিরঙ্গের কোর্ত্তা গায়, অধিকারীদের বাগানবাড়ীর দিকে যাইতেছিল ও মিহি গলায় গাহিতেছিল—'বিদেশী এক বোন-পো আমার এ মালা গেঁথেছে ফুলে।'

কিন্তু সেই দিন জগা যথারীতি আমডালাগ্রামে সন্ধ্যায় গানবাজনার আসরে উপস্থিত ছিল এবং তার পর আর কোথায়ও গিয়াছে, এরূপ প্রমাণ পাওয়া গেল না। সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে সন্দেহ টিকিল না।

নীলমাণিকের নিশ্চয় বিশ্বাস, রাণী অভিমানে প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছে। কানাই নদেতেই হউক কিংবা কোন পুকুরেই হউক, সে ডুবিয়া মরিয়াছে। "এ অভিমান কেন রাণী? হায়, এ দোষ আমার! আমি তোমার মনোরঞ্জন করিতে পারি নাই, সে শক্তি ঈশ্বর আমায় দেন নাই—নতুবা আমি ত প্রাণ দিয়া তোমাকে ভালবাসিয়াছি ও খুসী করিতে চেষ্টা করিয়াছি।"

এ দিকে যে দিন ভগবান্ অধিকারী স্বর্গলাভ করিয়াছে, সে অবধি দুরন্ত হাঁপানির পীড়ায় অন্নপূর্ণা শয্যা লইয়াছে। বাড়ীর এই দ্বিতীয় বিপদে সে একেবারে জীবনের হা'ল ছাড়িয়া দিয়াছে। নীলা কি করিয়া বসিবে—এই ভাবনায় সে আহার-নিদ্রা ছাড়িয়া দিল।

কিন্তু নীলা বিশেষ কিছু করিল না। মাকে বলিল, "মা, তুমি বাড়ীতে থেক—আমি নিজে বউকে দুদিন খুঁজে দেখি।" মায়ের নিষেধ সে শুনিল না—চলিয়া গেল। পনের দিন পর শুকনা একখানি কাঠের মত সে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার কোঁকড়ান চুলগুলি এলোমেলো, বুকের হাড়গুলি গণিয়া লওয়া যায়, উদাস দৃষ্টিতে সে কোন দিকে তাকাইয়া থাকে—যে যে কথা বলে—তাহার এলোমেলো উত্তর দেয়। ভয়ে অন্নপূর্ণা বউএর কথা তোলে না—তাহার মনের সমস্ত দুঃখ ও প্রার্থনা সে বিছানায় পড়িয়া রাধাবল্লভকে জানায়—এই চিরন্তন রীতিপালনে তাহার যতটুকু সান্ত্বনা পাইবার, তাহাই সে পাইয়া থাকে।

১১

সহসা নীলমাণিক সেই দেশে উৎকৃষ্ট কীর্ত্তনীয়া বলিয়া খ্যাতি লাভ করিল। তাহার পিতার দলটি নাবিক-হীন তরণীর ন্যায় স্রোতের জলে ভাসিতেছিল। তাহারা বলিল—"নীলা, তুমি ত ময়নাডাঙ্গা হ'তে কীর্ত্তন শিখিয়া এসেছ—তোমার সুরও মন্দ নহে। আমাদের এত দিনের দলটি কি একবারে নষ্ট হ'য়ে যাবে?" নীলমাণিক কীর্ত্তন গাহিতে স্বীকার করিল। সে প্রথম দিন 'অভিসার' পালাটি ভালরূপ অভ্যাস করিয়া লইয়া এক বড় গৃহস্থের বাড়ীতে আসরে আসিয়া দাঁড়াইল। গৌরচন্দ্রিকা শেষ করিয়া যখন সে "শ্যাম অভিসারে—চলল বর সুন্দরী" —অনন্ত দাসের এই পদটি ধরিল, তখন এক অপূর্ব্ব উন্মাদনার সৃষ্টি হইল। তাহার মুখ হইতে গানের একটু অংশ বাহির হইতে না হইতেই লোকে কাঁদিয়া আকুল হইল।

এমন মিষ্ট, এমন করুণ স্বর তাহারা জীবনে কখনও শোনে নাই, এই কথা একবাক্যে সকলে বলিয়া উঠিল। নীলমাণিক যে এমন গায়ক, তাহা ত তাহারা জানিত না। "শ্যাম অভিসারে—চলল বর সুন্দরী"—এ কোন্ অভিসারিকার অভিসার ? নীলমাণিক নিজে কোন্ অভিসারিকার রূপ দেখিয়া আত্মহারা হইয়া গিয়াছে—সুরের একটা করুণ টানে তাহাকে আনিয়া শ্রোতার কাছে দাঁড় করাইল! তার পর সে গাহিল—"পিঠে দোলে হেম-ঝাঁপা, রঙ্গিয়া পাটের থোপা" ; এই স্বর্ণখচিত ঝাঁপার সহিত বেণী পিঠে দোলাইয়া অভিসারিকা কোথায় যাইতেছেন ? তাঁহার নীলাম্বর কোন্ পীতাম্বরের সন্ধানে উড়িয়া চলিয়াছে ? কে এই অপূর্ব্ব রূপবতীর লক্ষ্য ? তার পর অঙ্গগন্ধে উন্মত্তবৎ ভ্রমরেরা তাঁহার আল্‌তাপরা পায়ের দাগগুলি পদ্ম-ভ্রমে চুম্বন করিতেছে ; চকোর ও রাহু সেই মুখখানিকে চন্দ্র ভ্রম করিয়া যেন লোভ বশতঃ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে ; কিন্তু "ধনী আনত আননে চলি যাওয়ে।"

শরদিন্দুর মত মুখ খানিতে বিন্দু বিন্দু মলয়জ। কোন্ অপূর্ব্ব সুন্দরীকে দেখিয়া নীলমাণিক তাহার কথা এমন পরিচিতভাবে এমন আবেগের কণ্ঠে গাহিতেছে? গাহিতে গাহিতে নীলমাণিক শ্রোতাদিগকে একেবারে ভুলাইয়া ফেলিল,—যেন কোন গুপ্ত বৃন্দাবনের অভিসারিকা নীলমাণিকের হৃদয়কুঞ্জ হইতে সৌন্দর্য্যের—প্রেমের একটা রূপ ধরিয়া সেই আসরে আসিয়া দাঁড়াইল। সে গানের দ্বারা যেন ছবি আঁকিয়া যাইতে লাগিল—শব্দকুহকে ফুলের গন্ধ এবং বসন্তের হাওয়া সেই আসরে আনিয়া ফেলিল ও গানের মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় নূপুরের শিঞ্জন শুনাইল।

সেই অপূর্ব্ব শব্দ-মন্ত্রে শ্রোতৃদল একবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। তারপর নীলমাণিক যখন গাহিল—"চৌদিকে রমণী শোভে, ডম্ফ-রবাব বাজে," তখন উপস্থিত ব্যক্তিগণ দেখিলেন, যেন অভিসারিকার ভয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তিনি আর পায়ের নূপুর খুলিয়া চলিতেছেন না,—তিনি অন্ধকারে নীলাম্বরীতে গা ঢাকিয়া একা চলিতেছেন না। চারিদিকে

রমণীর গৌরবের ডঙ্ক-রবাব বাজাইয়া চলিতেছে। তিনি আর প্রেমের কথা গোপন করিবেন না—রাজপথে ডঙ্কা-নিনাদে জানাইয়া যাইবেন! এ কাহার অভিসার? কোন্ রমণীর ভয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে? সে কাহার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া প্রেমের জয়-নিশান উড়াইয়া কোথায় যাইতেছে? নীলমাণিকের সুর উন্মত্ত হইয়া একবার পৃথিবীর কথা বলিতে বলিতে যেন প্রলাপের মত অপার্থিব কোন রাজ্যের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে। শ্রোতারা স্বপ্নের মত কি শুনিল, তাহা যেন সকলে ভাল করিয়া ধরিতে পারিল না; কিন্তু এই সংসারের ভালবাসা যে ত্রিপথগামিনী, তাহা কোন সময়ে ভোগের ভোগবতী-- কোন সময়ে পাপনাশিনী গঙ্গা এবং ক্বচিৎ দেহের গণ্ডী ছাপাইয়া অতীন্দ্রিয় আনন্দের মন্দাকিনী, তাহা কেহ স্পষ্টভাবে, কেহ অস্পষ্টভাবে বুঝিল। পদ-কর্ত্তাদের পদ ভীষ্মের আদেশে অর্জ্জুনের বাণবিদ্ধ ধরিত্রীর ন্যায় তাহার হৃদয়ে ঘা' দিয়া যেন অমৃতের উৎস সৃষ্টি করিল।

সে নিজে ছবির মত স্থির, কিন্তু শ্রোতারা কাঁদিয়া আকুল। যেন সর্ব্বস্বহারা নীলমাণিকের চিররুদ্ধ শোক বৈষ্ণব পদের মধ্যে এই অপূর্ব্ব কান্না ঢালিয়া দিয়াছে!

অভিসার মিলনান্ত। যখন নীলা "আদরেতে আগুসারি, রাইকে হৃদয়ে ধরি, পুছত হি পন্থ কি দুঃখ" এই গানটি গাহিল, তখন সকলে বুঝিল, যেন কাহার পথের কষ্ট গায়ক অতি করুণ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিতেছে— কাহাকে অগ্রসর হইয়া আদরে হৃদয়ে ধরিবার জন্য যেন সে ব্যাকুল হইয়াছে, নতুবা এই সামান্য পদ তাহার কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়া সকলকে কাঁদাইতেছে কেন? তার পর "নিজ করকমলে চরণ-যুগ মুছই," অসীম প্রেম লইয়া আমরা নিজ হস্তে কাহার পদযুগল মুছাইতে চাই? এই সেবার জন্য হাত উদ্যত হইয়া আছে—কিন্তু লোক ত হাত এড়াইয়া যায়, ধরা দেয় না। "এ ভর দুপুর বেলা—তাতিল পথের ধূলা—কমল জিনিয়া পদ তোর"—সেই উত্তপ্ত ধূলিতে কোমল পদ্মোপম পা'-

দু'খানি পুড়িয়া যাইতেছে, এই শ্রান্ত অভিসারিকা কে? পীতবাসে তাহার পা' মুছাইয়া দিয়া তাহাকে ব্যজন করিব—কিন্তু কই, সে ত ধরা দিতেছে না। কিন্তু তাহাকে না পাইলে নয়—আমি মন্দির তৈয়ারী করিয়াছি, সেবা করিব কাহাকে? সে কে? কোথায় গিয়াছে? প্রত্যেকের প্রাণে সেবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া নীলমাণিকের সুর কাঁপিয়া কাঁপিয়া, যেন কাঁদিতেছে—সমস্ত বায়ুমণ্ডল যেন সেই সুরের মূর্চ্ছনায় আকুল হইয়া মানবাত্মার সেই হারাণো রতন খুঁজিতেছে। তার পর নীলা যেন আর মিলন গাইতে পারিতেছে না, সে আবেগে কম্পিত-কণ্ঠে গাহিল—"চূড়া হৈতে গুঞ্জা-ফল তুলি শ্যামরায়। নম প্রেমময়ী বলি দিলা রাধার পায়।" আমি রাখাল, প্রেম এমন মহার্ঘ জিনিষ, আমি তাহার মূল্য কি জানিতাম! তুমি শিখাইয়াছ, তাই জানি—তুমি রূপের বাতি জ্বালিয়া পূজার ঘর দেখাইয়া দিলে, তাই চিনিলাম। এই জন্য আমার মাথার যে চূড়া—

যাহার বড় কিছু নাই, তাহার সেরা শোভা গুঞ্জা-ফলটি তোমার পায়ে দিয়া ধন্য হইলাম। এইবার নীলার সুর প্রকৃতই কাঁপিয়া উঠিল—তাহার জীবনের যা' কিছু শ্রেষ্ঠ, তাহা কাহার পায়ে দিবে? সকলেই দিতে চায়—এই দেওয়ার জন্যই মানুষ ঘুরিয়া মরিতেছে—কিন্তু দিতে পারে কই? হাতের নৈবেদ্য হাতে থাকিয়া যাইতেছে; যে দিতে পারিয়াছে, সে ধন্য; তাহার কথা বলিতে যাইয়া নীলার সুর আবেগে কাঁপিয়া উঠিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতৃবর্গ আত্মহারা হইয়া গিয়াছে। মিলনের শেষ দুই পংক্তি—"তখন খসায়ে চাঁপার মালা, এলায়ে কবরী। বন্ধুর যুগল পদ বাঁধেন কিশোরী।" দুই জনে যখন দুই জনকে এই ভাবে চায়, এবং গিরি-তুল্য বাধা অতিক্রম করিয়া দুই জনে যখন এই ভাবে দুই জনকে পায়—তখনই মিলন মধুর হয়; সেই মিলনের কথা নানা ছন্দে নানা কবি-কথার ঝঙ্কারে নীলমাণিক শ্রোতৃবর্গকে শুনাইয়া গেল। সে দিন গ্রামের

হাটে-পথে সকলেই নীলমাণিকের কীর্ত্তনের প্রশংসা করিল। তার পরদিন নিকটবর্ত্তী বাসদেবপুর গ্রামের ব্রাহ্মণ জমিদার রামরতন রায়ের বাড়ীতে নীলমাণিক পূর্ব্বরাগের পালা গাহিতে আহূত হইল।

নীলমাণিকের গৌরচন্দ্রিকাতেই কান্না সুরু হইয়া গেল। গোরাচাঁদ কাহাকে চান? তাঁহার পদ্ম-দলের মত দুটি বিশাল চক্ষু ফুলবনের দিকে চাহিয়া কেন জলে ভরিয়া উঠে? ক্ষণে প্রলাপোক্তি করিয়া তিনি কদম্ববৃক্ষের দিকে চলিতেছেন, কখনও কি দেখিয়া পাগলের মত হাসিতেছেন!

খোলের উচ্চ শব্দ, খঞ্জনীর ঝন্‌ঝনি, দোহারদের তান ইহার মধ্যে যেন একখানি বীণা কাঁদিয়া কাঁদিয়া কি গান গাহিতেছে! নীলমাণিক বাঁশীর সুরের কথা গাহিতে লাগিল। বাঁশী কে বাজায়? তাহাকে কখনও রাধা দেখেন নাই, সে কে? তিনি যখন সংসারের কাজ করিতে বসেন—বাঁশীর সুর তাঁহার সমস্ত কাজ ভুলাইয়া

দেয়। তাঁহার ঘরে গুরুজন, চারিদিকে পরিজন —ইহাঁদের মধ্য হইতে কে বাঁশী বাজাইয়া তাঁহাকে ঘরের বাহির করিতে চাহে? রন্ধনগৃহে রাধা বাঁশীর সুর শুনিয়া কাঁদিয়া উঠেন, কে তুমি, তোমার পায়ে পড়ি, বল। আমি তোমার সুর শুনিয়া আপনাকে সামলাইতে পারিতেছি না। তুমি কে আমায় এই ঘর-কন্না দিয়েছ, স্বামী দিয়েছ, আবার কেই বা এঁদের মধ্য হইতে টানিয়া লইয়া কোথায় কোন্ অজানা স্থানে দাঁড় করাইতে চাহিতেছে? রাধা নর্ম্মসখীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সেই বংশীবাদককে আমাকে চিনাইয়া দাও—তাহার সুর শুনিয়া মনে হইতেছে—আমি দাসী হয়ে তার পায়ে আপনাকে নিছিয়া ফেলি। বল, বড়াই, সে কে? তাহার আনন্দের সীমা নাই, মনের হর্ষে সে বাঁশী বাজাইতেছে, কিন্তু আমি তার পায়ে কি দোষ করিয়াছি? ওই সুরে আমার সর্ব্বস্ব ভাসিয়া গেল। শেষে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে রাধা বলিতেছেন—

"কি লাগিয়া ডাক রে বাঁশী আর কিবা চাও।
বাকী আছে প্রাণ মোর তাহা লয়ে যাও॥"

সবই গেছে—প্রাণটি যেতে বাকী! এমন আর্ত্ত মধুর কণ্ঠে নীলমাণিক গাহিতে লাগিল যে, সেখানে যেন শত মন্দাকিনী-ধারা বহিয়া গেল। যিনি সংসারে আমাদের পাঠাইয়া সংসার করিতে দেন না, বার বার বাধা দিয়া, চুলের মুঠি ধরিয়া নিজ পাদপদ্মের নিকট টানিয়া আনেন—সেই অব্যক্ত অচেনা পুরুষের টান সকলেই অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে লাগিলেন। কখনও নীলাভ রঙ্গের ধাঁধায় পড়িয়া রাধা ফুলের মালা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া স্বীয় মুক্ত কুন্তলের বর্ণ-সৌন্দর্য্যে আত্ম-হারা হইতেছেন—কখনও নব মেঘ ও তমালের বর্ণ তাঁহার চক্ষু মুগ্ধ করিতেছে, কখনও বা ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠ তাঁহাকে ধাঁধা দিতেছে। সমস্ত জগৎ কৃষ্ণবর্ণে তাঁহার চক্ষে মধুময় হইয়া উঠিয়াছে। দণ্ডে শতবার ঘরের বাহির হইতে-ছেন—সঘনে নিশ্বাস পড়িতেছে এবং একদৃষ্টে কদম্ব-কান-

নের দিকে চাহিয়া আছেন—যমুনার জলে কলসী লইয়া কালো জলের বাহার দেখিয়া পাগলিনীর ন্যায় কাঁদিতেছেন, কাঁথের কলসী জলের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে।

নীলমাণিকের মন আকুল হইয়া হারাণ রূপ খুঁজিতেছিল,—পদের অক্ষরে অক্ষরে তাহার নিজের অনুভূতি জীবন্ত রস ঢালিয়া দিতেছে।

কীর্ত্তন-শেষে বহুলোক নীলমাণিকের পরিচয় লাভ করিয়া ধন্য হইলেন! ব্রাহ্মণ জমিদার রামরতন রায় স্বয়ং তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আজ যে আনন্দ পাইলাম, এমনটি জীবনে অল্পই ঘটে, এই ৬।৭ ঘন্টাকাল আমরা প্রকৃতই বৃন্দাবনে ছিলাম, পৃথিবীর ধূলি-মাটী আমাদের গায় লাগে নাই।" বহু অর্থ লাভ করিয়া যখন নীলমাণিক গৃহে ফিরিবে, তখন জমিদার-বাড়ীর দ্বিতল গৃহের একটা খড়খড়ি ঝনৎকার করিয়া খুলিয়া গেল এবং শুভ্র-বসন-পরিহিতা একটি পরমা সুন্দরী যুবতীর চক্ষু নীলমাণিকের চক্ষে পড়াতে

তিনি অবগুণ্ঠন টানিয়া সরিয়া গেলেন; কিন্তু আর একটা খড়খড়ির একটা পাখী আস্তে আস্তে খুলিলেন এবং নীলমাণিককে যত দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়, তাঁহার বড় দুটি কৃষ্ণ চক্ষু দ্বারা তাহার অনুসরণ করিলেন। নীলমাণিক খড়খড়ি খোলার শব্দে একবার ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া তাঁহাকে ছায়ার ন্যায় দেখিয়াছিল। এ বিষয়ে আর কিছু লক্ষ্য করা বা মনে রাখার মত তাহার ঘটে নাই।

বাসায় ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিল, তাহার উঠান উপঢৌকনে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। নানারূপ আম, লেবু, সন্দেশ ও মিষ্টান্ন সেখানকার ভদ্র গৃহস্থেরা তাহাকে পাঠাইয়াছেন। একটি দরওয়ান তাহাকে সেলাম করিয়া বলিল—"জমিদার বাবুর মেয়ে তাহাকে কয়েকটি গোলাপ-খাস আম, এবং নিজের হাতে সাজা পান ও কয়েকটি সন্দেশ খাইতে দিয়াছেন। একটি রূপার প্লেটে করিয়া সেগুলি সে তাহার নিকট রাখিয়া দিল। নীলমাণিক বলিল, "মাইজিকে আমার বহুৎ প্রণাম জানাইও, আমি নিজে

তাঁহার প্রসাদ খাব।" আর একটি শূদ্র-মহিলা নানারূপ খাওয়ার সামগ্রী একটি পরিচারিকা দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। পরিচারিকা তাহাকে একটা নির্জ্জন জায়গায় ডাকিয়া লইয়া, নিজের আঁচল হইতে একখানি চিঠি তাহার হাতে দিল এবং বলিল, "আপনি ইহার জবাব দিবেন।" নীলমাণিক চিঠি খুলিয়া পড়িল। তাহাতে লেখা আছে—তাহাদের বাড়ীর পেছনে যে আমবাগ আছে, তাহাতে সেই মহিলার পরিচারিকা তাহার জন্য রাতদুপুরে প্রতীক্ষা করিবে, সাক্ষাৎ হইলে তিনি গোপনে তাহাকে কতকগুলি মনের কথা বলিবেন। রঙ্গিন চিঠির উপরে একটা ময়ূর আঁকা আছে এবং সেই ময়ূরকে তাঁহার হৃদয়ের গোপনীয় কথা বহিয়া লইয়া যাইবার জন্য একটা অনুরোধ কবিতা করিয়া লেখা আছে।

অতিশয় দুঃখার্ত্ত-স্বরে নীলমাণিক ঝিকে বলিল, "মাকে ব'ল, আমি তাঁর সন্তান, তাই ভাবিয়া যে অনুজ্ঞা করিবেন—আমি তাহা পালন করিতে প্রস্তুত আছি।"

ঝি কিছুকাল স্তব্ধ থাকিয়া কি বলিবে মনে করিয়াছিল কিন্তু শিশুর ন্যায় সরল, দুঃখভারাক্রান্ত, সজলনেত্র নীলমাণিকের মুখের দিকে চাহিয়া সে আর কিছু বলিতে পারিল না, ধীরপাদক্ষেপে চলিয়া গেল।

এ দিকে খাওয়ার সময় রূপার প্লেট হইতে একটা গোলাপখাস আম খাইয়া সেই প্লেটের সন্দেশের পার্শ্বে যে দুইটি পানের খিলি ছিল, তাহার একটির বিচিত্র কায়দা দেখিয়া সে খুলিয়া ফেলিল—তখন তাহার মধ্য হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির হইয়া পড়িল। তাহাতে লেখা ছিল :—

"আমি তোমার গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, কিন্তু কৃষ্ণলীলার গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে আমার কতকগুলি প্রশ্ন আছে। তুমি গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করিয়া তাহার সমাধান করিয়া দিবে কি?———অমলা।" সেই কাগজের টুকরা হইতে উৎকৃষ্ট ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ বাহির হইয়া কক্ষটি আমোদিত করিয়া তুলিল।

এই সকল ব্যাপার দেখিয়া, আর দুই বাড়ীতে কীর্ত্তনের পালা ঠিক থাকা সত্ত্বেও বায়না ফিরাইয়া দিয়া, নীলমাণিক পরদিন অতি প্রত্যুষে নারাণপুর চলিয়া গেল।

আরও পাঁচ বৎসরের মধ্যে নীলমাণিকের নামযশ সমস্ত বঙ্গদেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার স্বভাবের অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সে দিন-রাত্রি একা থাকিতে ভালবাসে। তাহার চক্ষে এখন আর জল নাই। সে শুধু আসরে কীর্ত্তন গাহিয়া ক্ষান্ত হয় না, দিবা-রাত্র সে নির্জ্জনে একা গুণ্ গুণ্ স্বরে কি গাহিয়া মনের ভার হ্রাস করে। সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, সে সুকঠিন বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া, কেবল মহাজনদের পদের ভিতর তাহার প্রাণের কথা পায়, তাহাই তাহার আসরে প্রতিভা ও নির্জ্জনে সান্ত্বনা। এই কীর্ত্তন গাহিয়া দেশবিদেশ ঘুরিয়া সে দেখিল—গ্রামের মেয়েরা বাহিরে আসিবার আনন্দের জন্য ব্যাকুল হইয়া আছে—তাহাদের তীর্থদর্শন-কৌতূহল কতকটা ধর্ম্ম-ভাবের ফল সন্দেহ নাই,

কিন্তু অনেকটাই বাহিরের সঙ্গে পরিচয়স্থাপন করার প্রবল আগ্রহের ফল—অন্তঃপুরের গণ্ডীর পারে সংসারটা কিরূপ, তাহা ভাল করিয়া চিনিবার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা-জাত। অনেকে মনে মনে বহির্মুখী হইয়া আছে,—সমাজের উদ্যত বজ্রের ভয়ে তাহারা নিজদিগকে অনেকটা সামলাইয়া রাখিয়াছে, তাহাদের সুদীর্ঘ-অবগুণ্ঠন অনেক সময় সামাজিক শাসন বাঁচাইবার মুখোস মাত্র, কিন্তু তাহাদের প্রকৃতি পোষ মানে নাই। অবিরত তাড়না ও গঞ্জনার দরুণ কোথায়ও তাহাদের কোমল ভাবগুলি শুকাইয়া গিয়াছে, কোথায়ও বিদ্রোহের ধোঁয়া তাঁহাদের রন্ধনশালার ধোঁয়ার মত অন্তঃপুরের প্রাচীর ছাপাইয়া উঠিয়াছে; পথের পথিক পর্য্যন্ত তাহা টের পাইতেছে। প্রাচীন সমাজের যে কোমল ভাবগুলি ছিল, তাহা নূতন আব হাওয়ায় শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে; এখানে সমাজকে ফিরিয়া সেই স্থানে যাইতে বলা ও গঙ্গাকে হরিদ্বারে ফিরাইয়া লইবার চেষ্টা তুল্য। নারী-প্রকৃতি যাহাতে বড় হয়,

তাহাও আনন্দের মধ্য দিয়া তাহাকে দিতে হইবে—শাসনের ফলে কোন প্রকৃত লাভ ঘটিবে না, ইহা নিশ্চয়। শিক্ষাদীক্ষা সকলেরই সময়োপযোগী ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমরা যাহা লইয়া গৌরব করি ও মনু-যাজ্ঞবল্ক্য-শাসিত সমাজের প্রশংসা করি, তাহার ভিত্তি কত অসার, কীর্ত্তন গাহিতে যাইয়া, অনেক স্থলে নীলমাণিক তাহা টের পাইয়াছে। শাস্ত্রবচন যে ঋষির মুখ হইতেই নিঃসৃত হউক না কেন—উহা কোন কালেই অত্যাচারীর প্রতি ভক্তি জন্মাইতে পারিবে না।

নীলমাণিক অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল, কিন্তু তাহার মাতার প্রাণান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও সে নূতন সংসার গ্রহণ করিতে স্বীকার করিল না।

১১

আরও পাঁচ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। একদিন সন্ধ্যাকালে নীলমাণিক সত্য সত্যই 'মা' 'মা' বলিয়া

কাঁদিয়া গণ্ড ভাসাইয়া দিতেছে! তাহার পূর্ব্বরাত্রে তাহার মা চলিয়া গিয়াছেন। সংসারে তাহার মা ছাড়া কেহ ছিল না! শিশুকালে একদিন রাখালরাজ বৈষ্ণব তাহাকে কাপড় দিয়া হাতে-পায়ে বাঁধিয়া ক্রীড়াচ্ছলে কানাই নদের জলে ফেলিয়া দিবে – ভয় দেখাইয়াছিল—জানালা দিয়া মা তাহা দেখিতে পাইয়া কিরূপ আকুলিব্যাকুলি করিতেছিলেন, আজ তাহার মনে পড়িল; "মা, তুমিই কিনা আজ আমাকে অকূল সমুদ্রে ফেলিয়া গেলে! তুমি হাঁপানি রোগে বিছানায় পড়িয়াছিলে, অতি কষ্টে উঠিতে পারিতে—আমি তোমার রোগক্লিষ্ট স্নেহ-মাখা মুখখানি দেখিবার জন্য পাগল হইয়া কীর্ত্তন গাহিয়া বাড়ীতে ফিরিতাম!" দেহত্যাগের দুই দিন পূর্ব্বে অপরাহ্নে নীলা বাড়ী ফিরিয়াছে—তাহার খাওয়া-দাওয়া হয় নাই—বেলা হেলিয়া পড়িয়াছে। সেই মৃত্যু-শয্যা হইতে উঠিয়া মাতা তাহার স্নানের জন্য জলের কলসীটা টানিয়া বাহির করিতে গিয়াছিলেন।

গরু দোহান হইলে মা হাঁপাইতে হাঁপাইতে মাণিকের জন্য দুধটুকু আনিতে যাইতেন! তোমার স্নেহে যে তাহার বুকটা জুড়াইয়া যাইত! এখন সে একলা বাড়ীতে কাহাকে লইয়া থাকিবে? বাড়ীতে রাধা-বল্লভের কে আর সেবা করিবে? নীলার পীড়ার কথা, দুঃখের কথা আর কে রাধাবল্লভকে দিনে দশবার শুনাইয়া আসিবে? কত কথাই মনে পড়িতে লাগিল। একদিন অন্নপূর্ণা শুনিলেন, তাঁহার নীলা শাশুড়ীকে 'মা' বলিয়া ডাকে। ইহা শোনা মাত্র বাড়ীর উত্তরদিকে মানকচু-গাছতলায় বসিয়া, পুত্র মরিলে মা যেরূপ কাঁদিয়া থাকেন, সেই ভাবে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। নীলমাণিক কতই না বিরক্ত হইয়াছিল—রাণী বলিয়াছিল, "দেখ্‌লে তোমার মায়ের কীর্ত্তি—এই ব্যাপারের অর্থ কে করিবে?" তখন অর্থ বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু তোমার সাধের নীলু এত দিনে বুঝিয়াছে, তুমি যাহাকে প্রাণাপেক্ষা শত শত গুণ বেশী ভালবাসিতে—যাহাকে

তুমি রাধাবল্লভের সেবা ভুলিয়া সেবা করিয়াছ, যে তোমার বুক-চেরা ধন ছিল—তাহার কাছে তুমি অন্য কোন প্রতিদানের প্রত্যাশা কর নাই—শুধু মা ডাকের প্রত্যাশা করিতে। সেই দাবীতে আর কাহাকেও ভাগ দেওয়া তোমার অসহ্য হইয়াছিল। দিনরাত যাহাকে একদণ্ড না দেখিলে পাগলের মত থাকিতে, আজ তাহাকে কাহার হাতে ছাড়িয়া গেলে? আজ তোমার পাগল ছেলেকে কে খাওয়াইবে? তোমার ঘরে তোমাকে ছাড়া সে শুইবে কিরূপে? রোগের শয্যায় পড়িয়াও যে তুমি তাহার নিকট রাজার মত ছিলে, তোমার কাছে সে তাহার সমস্ত নালিশ, সমস্ত অভিযোগ না জানাইয়া ক্ষান্ত হইত না। তাহার বুক পুড়িয়া খাক হইয়া গিয়াছে, রাণী তাহার সর্ব্বস্ব সুখ চুরি করিয়া পলাইয়াছে। আজ তাহার আর কি আছে?—সে সুমিষ্ট 'নীলু' ডাক আর কার মুখে শুনিবে? সে জীবন ভরিয়া তোমাকে খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা লইয়া জ্বালাতন করিয়াছে। আর

করিবে না—এই একটি কথা শুনিয়া যাও। তুমি ত দিনরাত নীলুকে সেবা করিয়াছ, সে একদিনও তোমার সেবা করে নাই। ফিরিয়া এস, সে তোমার পা' পাখালিয়া দিবে,—তোমার ক্লান্ত দেহ ব্যজন করিয়া ঠাণ্ডা করিবে। তুমি যে তাহার রাধাবল্লভের উপর, সে আজ নিজে বুঝিয়াছে। তুমি একবার বুঝিয়া যাও। শাস্ত্রে বলে, মা স্বর্গ হইতেও বড়। ঐ স্বর্গ দেবনিবাস, কত উচ্চে! দেবতাদের অনধিগম্য স্থানের লোক আসিয়া আমাদের এই ধূলি-মাটীর ঘরে কত দুঃখে প্রাণ দিয়া সেবা করিয়া গেলেন—তাঁহার প্রতি-সেবা ত কিছুই করা হইল না!

রাত্রে নীলমাণিক শুইয়া স্বপ্নে দেখিল, সে তাহার মায়ের পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া শুইয়া আছে। স্বপ্নে পা ছুঁইতে গেল—নিজের রাশীকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিয়া কত কথা কহিতে গেল—মা পা টানিয়া নিলেন; তখন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল সে শূন্য বিছানায়

পড়িয়া ধড়ফড় করিতে লাগিল। তখন সে কাঁদিয়া বলিল, "আমি মা-হারা ছেলে—কিন্তু পৃথিবীতে অনেকের মা আছেন—আমি যুক্তকরে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতেছি। আমার মত হতভাগ্য ছেলেরা—যাহারা মাতৃসেবার অপরাধী, আমি তাহাদের হইয়া, মা'দের নিকট মার্জ্জনা চাহিতেছি। যাহারা ছেলেদের রোগে দুঃখে আমারই মায়ের মতন প্রাণান্ত কষ্ট পান, আজ আমি তাহাদের মধ্যে আমার ত্যাগশীলা-দুঃখ-সহা মাকে পাইয়া প্রণাম করিতেছি।

"আর রাধাবল্লভ আমাকে কি দিয়া নারাণপুরে রাখিবেন? আমার ধর্ম্মপ্রাণ নিরীহ পিতৃদেব চলিয়া গিয়াছেন—দিদি কাশীবাসিনী, রাণী নাই—আজ যাঁহাকে লইয়া ভাঙ্গাবুক জোড়া দিয়াছিলাম, তিনিও গেলেন। রাধাবল্লভ আমাকে স্নেহ-মায়ার সমুদ্রে ফেলিয়া সমস্ত মায়া সংবরণ করিলেন।"

তখন নীলমাণিক তাহার বাগানে যাইয়া প্রত্যেক

বৃক্ষকে প্রণাম করিল; "হে রাধাবল্লভ, ইহাদের হাতে তুমি আমাকে ছয় ঋতুতে ছয় রকম উপহার পাঠাইয়াছ— আমি খাইয়া তৃপ্ত হইয়াছি, কিন্তু যিনি পাঠাইয়াছেন, তাঁহাকে মনে করি নাই।" ফুলতরুগুলির নিকট যাইয়া যুক্তকরে প্রণাম করিল—"কে রোজ রোজ তোড়া বাঁধিয়া এই সমস্ত সুঘ্রাণযুক্ত সৌন্দর্য্যের ডালি আমাকে উপহার দিয়াছেন? আমি তাঁহাকে ভাবি নাই। তোমার জিনিষ সর্ব্বদা ভোগ করিয়াছি, কিন্তু হে রাধাবল্লভ, তোমাকে প্রাণের সহিত তাহা নিবেদন করিয়া দিই নাই। আজ হতভাগ্য মাতৃহারা ছেলে পুণ্য মাতৃভূমি ছাড়িয়া চলিয়াছে—তুমি আমাকে কোথায় কি ভাবে রাখিবে—তুমি জান, আমি তাহা ভাবিব না।"

দেশত্যাগ করিবার পূর্ব্বে সে বৃদ্ধ রামজীবন সরকারের উপর রাধাবল্লভের মন্দিরের সংস্কার করিবার টাকা রাখিয়া গেল। তাহার জমিজমার যে আয় ছিল, তাহা সকলই দেবসেবার জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিল।

কিন্তু রামজীবনকে নীলা বলিয়া গেল, "যখন আমাদের গাছে নিচু ও আম পাকিবে, তখন এই গ্রামের সমস্ত ছেলেকে খবর দিবে। শীতকালে পুকুর-পাড়ের গাছটায় অনেক কমলালেবু হয়—এ তল্লাটে লেবু ফলে না, ফলিলেও মিষ্ট হয় না, বাবা অসাধ্যসাধন করিয়া গিয়াছেন, আমাদের লেবুগুলি ছিলেটের লেবুর মতই মিষ্টি। কামরাঙ্গা গাছটার ফল বারমাস ফলে এবং আমাদের সরবতী লেবু গ্রীষ্মকালের অতি চমৎকার খাদ্য। উত্তরধারে পুকুরপাড়ে গোলাপজাম প্রচুর হয়—যে দিনের যে ফল, তাহা যেন গাঁয়ের ছেলেরা পাড়িয়া খায়—ইহারাই বালগোপাল, আমার গাঁয়ের মা যশোদারা এই ফল ছেলেদিগের হাতে দেখিলে যে আনন্দ পাইবেন, সেই আনন্দ দূর হইতে কল্পনা করিয়া আমি তৃপ্ত হইব।"

মন্দিরের উপস্বত্ব রাধাবল্লভের সেবায় ব্যয় করিবার ব্যবস্থার মধ্যে দরিদ্রদিগের জন্য একটা

অন্নসত্রের সংস্থান রহিল। এই ভাবে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া নীলমাণিক প্রবাসে যাত্রা করিল।

১২

নীলমাণিককে রায়পুরের রাজা কৃষ্ণপ্রসাদ রায় অনেকবার তাঁহার রাজধানীতে থাকিবার অনুরোধ করিয়াছিলেন; তাহাকে একটা প্রকাণ্ড দ্বিতল বাড়ী দান করিবার অভিপ্রায়ও তিনি জানাইয়াছিলেন। রায়পুর তাহার জন্মভূমি হইতে বহুদূরে, চতুরঙ্গে যাইতে হয়—রেল, ষ্টীমার, গোশকট ও নৌকায় প্রায় ৫।৬ দিন রাস্তায় কাটাইয়া রাজা বাহাদুরের আগ্রহাতিশয়ে নীলমাণিক সেইখানে উপস্থিত হইল। বলা উচিত, তাহার দলটিও তাহার অনুগমন করিয়াছিল। সে যে আর দেশে আসিবে না, তাহা রামজীবন সরকার ভিন্ন, গ্রামের আর কেহ জানিত না। কীর্ত্তন গাহিতে নীলমাণিক

বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়ায়—গ্রামবাসীরা এবারও তাহাই মনে করিল।

যখন কানাই নদ হইতে ষ্টীমার ছাড়িল, তখন নিজ গ্রামের বৃক্ষপংক্তি মঠ ও বাড়ীগুলি তাহার দৃষ্টিপথ ছাড়িয়া যাইতে লাগিল দেখিয়া সে হৃদয়ে গুরুতর ব্যথা অনুভব করিল। সে তাহার মা বাবাকে আজ যেন নূতন করিয়া হারাইল।

রায়পুরে লক্ষ্মীজনার্দ্দনের মন্দিরের নিকট প্রকাণ্ড দ্বিতল বাড়ীখানি কৃষ্ণপ্রসাদ নীলমাণিককে দান করিলেন। কৃষ্ণপ্রসাদ তাহার কীর্ত্তন বহুবার শুনিয়াছেন এবং তাহার প্রতি রাজার অকৃত্রিম অনুরাগ জন্মিয়াছিল। নীলমাণিক রাজা বাহাদুরকে বলিল, "আমার কেহ নাই, কীর্ত্তন গাহিয়া আমি কিছু টাকা সঞ্চয় করেছি, তাহাও আমার দলের লোকের হাতে—আমি তাহার হিসাব রাখি না। আপনার এই পোনের বিঘার উপর এত বড় অট্টালিকা ল'য়ে আমি কি করব? আপনার দান শিরো-

ধার্য্য, কিন্তু ইহা শেষে আপনারই থাক্‌বে—আমার ভোগ করিবার কেহ নাই।"

রায়পুর গ্রামখানিতে বহু ব্রাহ্মণের বাস। সাধারণতঃ বঙ্গদেশের পাড়াগাঁগুলি যেরূপ, এটি সেরূপ নয়। এখানে পানা দ্বারা ছোট ছোট ডোবার মুখ ঢাকিয়া যায় নাই; রাস্তাগুলি পরিষ্কার, তাহাদের উপর বাঁশঝোপ ও অন্যান্য গাছের ডগা ঝুঁকিয়া সেগুলিকে আঁধার করিয়া রাখে নাই এবং কোন গাছের ছোট ডাল ধরিয়া টানিলে এক হাজার একটি মশক গুণ্-গুণ্ করিয়া গাহিয়া উঠে না। এখানে ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী শিশু, যুবক ও বৃদ্ধকে ছুঁইয়া তাহাদের পেট প্লীহায় ডাগর করিয়া তোলে নাই। এখানে গভীর ড্রেণগুলিতে পাতা ও আবর্জ্জনা পড়িয়া একটা বিষাক্ত ক্বাথের সৃষ্টি করে নাই। এখানে হেলে, ঢোঁড়া প্রভৃতি নিরীহ সাপ এবং গোখরা, কেউটে প্রভৃতি ফণাধর লাঙ্গুল পাকাইয়া রাস্তায় পড়িয়া থাকে না ও ভাদ্র আশ্বিন মাসে বিস্তর লোকের প্রাণ সংহার করে না;

এখানে বাকোশ ও শিয়াল দিবাভাগে রাস্তায় আসিয়া ডাকে না এবং দশ আঙুল পরিমিত তেঁতুলে বিছে, ও চোখ-খেকো কালনাগিনী রাস্তায় যাইবার সময় গাছের ডাল হইতে মাথায় পড়িয়া পথিকের প্লীহা চমকাইয়া দেয় না। এখানে মিউনিসিপালিটির বাবুরা স্বীয় অধিকারের আয় বাটোয়ারা করিয়া লইয়া সেই লাভের থালায় কর্ম্মচারীদের সঙ্গে একত্র বসিয়া খান না এবং গ্রামখানি ধ্বংসের মুখে ছাড়িয়া দিয়া তামাসা দেখেন না। এখানে গুণ্ডারা গৃহস্থগণের কুলবধূগণকে শুনাইয়া এবং শুনাইবার জন্য দিন-দুপুরে শিষ দিয়া ঘোরে না এবং চোরের সিঁধ কাটিবার সময় চৌকিদার তাহাকে আড়াল করিয়া সহায়তা করে না। এখানে ভেককুল দিবারাত্রি বক্তৃতা করে না এবং নানারূপ পচা জঞ্জাল ও কাদার মধ্যে বকের মত পা ফেলিতে ফেলিতে পথিকেরা যাতায়াত করে না। এখানে রাত্রে শুধু জোনাকিরা রাজপথ আলো করিবার ভার গ্রহণ করে নাই, এবং আকাশ-

নিরোধী ঘন-বিনান পাতার অন্তরালে চন্দ্র কি তারা সুষুপ্ত গ্রামখানি উঁকি মারিয়া দেখিবার সুবিধালাভে বঞ্চিত হইয়া নিরাশ-চিত্তে আকাশে ঘুরিয়া বেড়ায় না, এবং পঞ্জিকার কথা ব্যর্থ করিয়া বার মাস ত্রিশ রাত্রি শুধু অমাবস্যা জল-স্থলে বিরাজ করে না। এখানে নিরন্ন ব্যক্তিরা আড়াই আঙুল জমি লইয়া ঝগড়া করিয়া মাথা ফাটা-ফাটি করে না এবং ঘর-বাড়ী বন্ধক দিয়া পাড়াগেঁয়ে জেদ বজায় রাখিবার জন্য নথিপত্র বগলদাবায় করিয়া এটর্ণিদের পাছে পাছে ঘোরে না। এখানে নিজের ভ্রাতৃ-বধূর কুৎসা, খুড়ীর কুৎসা দশজনের সম্মুখে গাহিয়া সেই বাড়ীর লোক বাহাদুরী দেখান না, এবং নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তির পর্ণকুটীর শ্রমশীল উপার্জ্জনকারীর পাকা কোঠার হিংসায় জ্বলিয়া খাক্ হইয়া যায় না। এখানে একবারে অদৃষ্টকে সম্রাট্ মনে করিয়া লোকে হা'ল ছাড়িয়া দিয়া আকাশের বৃষ্টি-বিন্দুর ন্যায় খামখেয়ালী দৈবের অনুকম্পার জন্য বসিয়া থাকে না; এবং ছিপ দিয়া মাছ ধরা ও দাবা-

খেলাটাই লোক-উত্তমের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না।

মোট কথা, রায়পুরের লোকের শ্রমশীল ও সম্পন্ন। রাজা কৃষ্ণপ্রসাদ অতি তেজস্বী ব্যক্তি। তিনি নিজের রাজধানীটি অনেক সহর হইতে ভাল করিয়া রাখিয়াছেন। কোন্ স্থানে একটু জঞ্জাল জমিল, কোন্ পুকুরের জলের রং একটু ঘোলাটে কি ঘন-সবুজ হইল, কোন্ স্থানে এক শত ফিটের অধিক স্থানে একটিমাত্র আলো আছে, কোন্ ঋতুতে রায়পুরে কোন্ রোগ দেখা দিল—এই সমস্ত বিষয়ের দিকে তাঁহার অতি তীব্র দৃষ্টি। রায়পুরের ড্রেণগুলি তিন হাত গভীর করিয়া খোঁড়া হয় নাই—সকলের বাড়ীর কাছেই অতি সামান্য ঢালু আছে, কিন্তু সেই ঢালু এরূপ সহজ ও সুগম যে, গ্রামে বিন্দুমাত্রও জল জমিতে পারে না।

এই গ্রামে আসিয়া নীলমাণিক অনেকটা শান্তি পাইল; বহু ব্রাহ্মণ তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে আসি-

তেন—তাঁহাদের হরিভক্তি দেখিয়া নীলমাণিক প্রীত হইল। প্রায়ই সে কীর্ত্তন গাহিতে নানা স্থানে যাতায়াত করে—কিন্তু লক্ষ্মীজনার্দ্দনের মন্দিরের পার্শ্বে রাজদত্ত প্রকাণ্ড বাড়ীটাতেই সে দল সহ বাস করিতে লাগিল। একদিন সে তাহার গৃহে বসিয়া আছে, এমন সময় হরিদাস চক্রবর্ত্তী নামক একজন ব্রাহ্মণ তাহাকে বলিলেন,—"ঐ যে লোকটিকে দেখ্ছেন, ওকে চিনেন ?" নীলমাণিক চোখ তুলিয়া দেখিল, একটি প্রায় ৭০ বৎসর-বয়স্ক বৃদ্ধ, গায় সাদা সাদা লোম ও মাথার উপরে খানিকটা টাক ; নাকের সাম্নে একটা বড় আঁচিল। বর্ণ শ্যামও নয়, কৃষ্ণও নয়—মাঝামাঝি ; হাতে গামছায় মাছ বাঁধা আছে ও মাথায় একটা ধামায় কতকগুলি লাউডগা, আলু ও বেগুন লইয়া হন্‌-হন্‌ করিয়া কোন দিকে দৃষ্টি না করিয়া যাইতেছে। নীলমাণিক বলিল—"না, বোধ হয়, জন খাটিয়া খায়।" হরিদাস চক্রবর্ত্তী হাসিয়া বলিল, "উহার নাম শশিপদ গাঙ্গুলী,—নিকষ কুলীন, বেগের

গাঙ্গুলী—উঁহার বাৎসরিক আয় প্রায় ১০,০০০ টাকা, বড়-বাড়ী, নিজে খুব ভাল সংস্কৃত জানেন—বাড়ীতে এত কাল একটা টোল ছিল।” নীলমাণিক সেই গ্রামের কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে সহজেই দ্বিধা বোধ করিত। সে কিছু বলিল না; কিন্তু তাঁহাকে যে সামান্য ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে, তজ্জন্য অনুতাপ প্রকাশ করিল। হরিদাস চক্রবর্ত্তী বলিলেন, “সেটা আপনার আর কি অন্যায় হইয়াছে? বাহিরের লোক—যাঁহার সঙ্গে ওঁর পরিচয় নাই—ওঁকে দেখিলে যা' ভাবিতে পারে, আপনি তাহাই ভেবেছেন।”

কিন্তু এই ঘটনার পর রায়পুর-নিবাসী সুদর্শন ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে নীলমাণিকের এই ভাবের কথোপকথন হইয়াছিল।

সুদর্শন।—শশিপদ বাবুর সবই ভাল; কিন্তু, অধিকারী মহাশয়, উঁহার মত কৃপণ এই রায়পুরে নাই। ইঁহার বিস্তর টাকা আছে, বাজারের জিনিষপত্র

আনিতে একটা মুটেকে কি দুটি পয়সা দিতে পারেন না? নিজে ঘাড়ে করিয়া মোট না বহিলেই কি নয়? রাত্রে এক পয়সার মুড়ি ও একটু দুধ উঁহার ভোজনের বরাদ্দ, অথচ উনি খাইতে পারেন বেশ। উঁহার খরচ কিছু নাই। বড় পুত্রটি ব্রহ্মদেশের উকীল;—সে নিজে বেশ উপার্জ্জন করে, সে পিতাকে সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্য যে টাকা পাঠায়, তাহাও তিনি ব্যয় করেন না—কনিষ্ঠ পুত্রটি দাদার কাছে রেঙ্গুনেই থাকে। শুনিতে পাই, সেও আজকাল দশটাকা উপায় করিতেছে। বাড়ীতে উনি এবং উঁহার স্ত্রী, ইচ্ছা করিলে রাজার হালে থাকিতে পারেন। কিন্তু আটহাতি একখান কাপড় পরিয়া যেন তেন প্রকারেণ লজ্জা সংবরণ পূর্ব্বক অর্দ্ধাশন করিয়া দিন গুজরাণ করেন।”

নীলমাণিক।—কিন্তু আপনি ত উঁহার সব কথাটুকু বলিলেন না। উঁহার পুত্রের বিবাহের সময় উনি বৈবাহিককে বলিয়াছিলেন—‘যা পারেন, তাই দিবেন; আমি

কিছু বলিব না।' বৈবাহিক দেড়টি হাজার টাকা লইয়া উঁহাকে দিতে গেলেন, উনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি না বলেছিলেন, আপনার অবস্থা ভাল নহে? এ টাকা আপনি কোথায় পেলেন?' তিনি বলিলেন, 'অবস্থা ভাল না হইলে কি? মহাশয়, ব্যয় যা'তে যেটা হবে, তাহা এড়াব কিরূপে? আমি অবশ্য দেনা করিয়া এই টাকা দিতেছি। অন্য স্থান হইলে আপনি তিন কি চার হাজার টাকা পেতে পারতেন। এই টাকা সামান্য ব'লে লইতে দ্বিধা বোধ করবেন না।'—ইহা শুনিয়া শশিপদ বাবু বলিলেন—'আপনি এই দেনা এখুনি মিটাইয়া দিন। আমি কপর্দ্দকও চাই না। এই মঙ্গলের দিনে আমি আমার বেহাইকে দেনায় ডুবাতে আসি নাই।' এই বলিয়া সে টাকা ফিরাইয়া দিলেন—আপনি এ ঘটনা জানেন কি?

সুদর্শন।—জানি।

নীলমাণিক।—আচ্ছা, রায়পুরের বংশী শিকদার

এক সময়ে বিপদে পড়িয়া উঁহার নিকট এক হাজার টাকা ধার করে। ৭ বৎসরে সুদে আসলে আড়াই হাজার টাকা হয়। ৭ বৎসরের পরে যখন সে টাকা ফিরাইয়া দিতে আসিল, তখন সে বলিল—'বাবাঠাকুর, আমাকে সুদ কিছু মাপ দিন—আমার বাড়ীর পাকা কোঠাটি সেই অর্দ্ধেক উঠিয়া আছে, এখনও ছাদ করিতে পারি নাই।' শশিপদ বাবু বলিলেন,—'আমি সব সুদ মাপ দিলাম।' এই বলিয়া শুধু এক হাজার টাকা লইয়া খত্‌খানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, এ ব্যাপার জানেন না কি?

সুদর্শন।—জানি।

নীলমাণিক।—উনি রোজই উঁহার বাড়ীর নিকট-বর্ত্তী প্রজাদিগের বাড়ীতে নিজেই খাজানা আদায় করিতে যান। কোন প্রজার বাড়ীতে যাইয়া দেখেন, তাহার তিন মাসের শিশুটি রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে—পিতা ডাক্তার ডাকিতে পারিতেছে না—মা কাঁদিতেছে, কেহ বা স্ত্রীপুত্র সহ একটা পুরো দিন অভুক্ত আছে, কেহ

বা চাকুরীটি খোওয়াইয়া বাড়ীতে বসিয়া পেট চালাইবার জন্য দেনা করিতেছে। শশিবাবু যদি দশ টাকা আদায় করেন, তবে বিশটি টাকা খরচ করিয়া আসেন। এই লাভের খাজানা আদায় ব্যাপারটা তাঁহার নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা—ইহা কি আপনি শোনেন নাই ?

সুদর্শন।—অধিকারী মহাশয়! এ সকলই জানি, কিন্তু তথাপি কার্পণ্য করেন কেন, বুঝিতে পারি না—ইঁহার চরিত্র একটা সমস্যাস্থল। অবশ্য, ইনি বড়ই পরো-পকারী—কাহার কিছু অসুখ হইলে এই বৃদ্ধবয়সে রাত জাগিয়া সেবা করেন, তাহাতে মুচি, মুসলমান বলিয়া ইঁহার ঘেন্না নাই। এজন্য আমাদের ব্রাহ্মণ-সমাজে ইঁহার বিলক্ষণ নিন্দা আছে। আপনি বলিতে পারেন কি, ইনি দান-বিষয়ে মুক্তহস্ত হইয়াও নিজের বেলায় এরূপ কার্পণ্য করেন কেন ?

নীলমাণিক।—আপনারা হয় ত জানেন, উনি ২১ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে হিমালয়

পর্ব্বতে গিয়াছিলেন। সেখানে উনি যে গুরুকে আশ্রয় ক'রে ছিলেন, তিনি উঁহাকে পুনর্ব্বার গৃহাশ্রমে পাঠায়ে দিয়েছিলেন। তাঁহার আদেশ—'তুমি নিজ সুখ-ভোগে বিরত হইয়া সংসারে শ্রম করিবে। এখনও সন্ন্যাসের সময় হয় নাই।'

১২

শশিপদবাবুর সঙ্গে নীলমাণিকের বয়সের বিশেষ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও খুব বন্ধুত্ব জমিয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের প্রথম পরিচয় এই ভাবে হয়;—একদিন সেখানকার শীতল চাটুয্যের বাড়ীতে নীলমাণিকের কীর্ত্তন হইবে। নিকটবর্ত্তী ৪।৫ খানি গ্রামের স্ত্রীপুরুষ চাটুয্যে-বাড়ীতে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। আসরে উপস্থিত হইয়া নীলমাণিক কোন্ পালা গাহিবে—জিজ্ঞাসা করিল। চাটুয্যে-গৃহিণীর বড়ই ইচ্ছা, সে দিন 'মাথুর' গাওয়া হয়। নীলমাণিক হাতযোড় করিয়া বলিল,—"আজ আমার

মাথুর গাওয়ার সাধ্য নাই—আর পালা বলুন।" শ্রোতৃবর্গ আশ্চর্য্য হইয়া গেল—'মাথুর' ও অপর পালাতে তফাৎ কি? অন্য কোন পালা গাহিতে পারিলে 'মাথুর' কেন গাহিতে পারিবে না?" এই সকল প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর না দিয়া নীলমাণিক শুধু নিজের দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া নিজ মনে বলিতে লাগিল— "সে আজ হবে না, হ'তে পার্‌বে না। সবাই ভাব্‌ছে গান—কিন্তু সে যে আমার প্রাণ।" কিন্তু চাটুয্যে মহাশয়ের পীড়াপীড়িতে অবশেষে তাহাকে 'মাথুর'ই ধরিতে হইল। একটিমাত্র গান গাওয়া শেষ না হইতে হইতেই শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অপূর্ব্ব উন্মাদনার সৃষ্টি হইল। তাহার মুখের "আহা" "উহু"ও যেন তাঁহাদের বুকে শেলের মত বিঁধিতে লাগিল। নিত্য যে সংযম রক্ষা করিয়া নীলমাণিক নিজে শুষ্ক-চক্ষে গান করিয়া অপরকে কাঁদায়, আজ সে গান গাহিতে যাইয়া উচ্ছ্বাসে নিজে কাঁদিয়া ফেলিতেছে ও বুক চাপিয়া ধরিয়া ঘন

ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছে। তার পর "আমারে ছাড়িয়া পিয়া মথুরায় রহল গিয়া—এও বিধি লিখিলা করমে—আমায় শ্যাম-হারা হ'তে হোল—এই কি ভাগ্যে লেখা ছিল"—এই আখর ও পদ গাহিতে গাহিতে তাহার চোখে বানের মত জল ছুটিল। কে তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে—কে তাহাকে চক্ষে চক্ষে রত্নের মত রাখিয়াছিল—আজ কাচের মত ফেলিয়া গিয়াছে! যাহাকে একদণ্ড না দেখিলে প্রাণ যাইত, নিদারুণ বিধি তাহার সঙ্গেও এই চির-বিচ্ছেদ লিখিয়াছিল! মাণিক আর গাহিতে পারিল না—তাহার মাকে মনে পড়িল কিংবা রাধাবল্লভকে মনে পড়িল কিংবা কোন অচিন্তনীয় হারাণ ধনকে মনে পড়িল! কে তাহাকে চক্ষে চক্ষে রাখিত, এখন অকূল সংসারে তৃণ-কুটার মত ছাড়িয়া দিয়াছে; কে তাহাকে ভালবাসিয়া শেষে স্রোতে ভাসাইয়া তামাসা দেখিতেছে—সুরের মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় সেই প্রাণের আর্তনাদ শোনা যাইতে লাগিল।

নীলমাণিক সমস্ত সংযম হারাইয়া পাগল হইয়া কাঁদিতে লাগিল। পদের সঙ্গে সঙ্গে শত শত "আখর" যেন গঙ্গোদকের মত কোন গুপ্ত হরিদ্বার হইতে প্রবাহিত হইয়া মানব-চিত্তের চির-বিরহের হাহাকার বুঝাইয়া দিয়া গেল।

শ্রোতারা দেখিল, নীলমাণিক মানুষ নহে—কোন শাপ-ভ্রষ্ট দেবতা—তাহার মুখের প্রত্যেকটি অক্ষর কাড়িয়া লইবার জন্য যখন তাহারা উৎকণ্ঠিত, এমন সময় নীলমাণিক সংজ্ঞাহীন হইয়া আসরে পড়িয়া গেল।

এই অচিন্তনীয় ঘটনায় সভার সমস্ত লোকই অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন ও নীলমাণিককে সকলেই সযত্নে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। শশিপদ গাঙ্গুলী গান শুনিতে এসেছিলেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আগ্রহ দেখাইয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন এবং যখন নীলমাণিকের সংজ্ঞালাভ হইল, তখন স্বয়ং তাহাকে বাড়ী পৌছাইয়া দিয়া তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় স্থাপন

করিলেন। বলা বাহুল্য, সে দিনকার মত গান বন্ধ হইয়া গেল।

১৩

এখন হইতে এই ভাবে নীলমাণিক প্রায়ই আসরে সংজ্ঞা হারাইতে লাগিল। ইহা একটা রোগে দাঁড়াইল। বহুস্থান হইতে নিত্য নিত্য কীর্ত্তনের জন্য তাহার আহ্বান হয়; কিন্তু সে তাহা প্রায়ই প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকে। শশিপদ গাঙ্গুলী এখন তাহার নিত্য-সহচরে পরিণত হইয়াছেন। যাহাকে একদিন সামান্য মুটে বলিয়া সে ভুল করিয়াছিল, তাহার সহিত নীলমাণিক যতই ঘনিষ্ঠ-ভাবে মিশিতে লাগিল—ততই তাহাকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিতে শিখিল। কিন্তু রায়পুর তাহার নিকট প্রথম যেরূপ মনে হইয়াছিল, সে ভাব বেশী দিন টিকিল না। প্রথমতঃ রাজাবাবুর প্রকৃতি ;—তিনি উদার, ধার্ম্মিক, লোকহিতৈষী ও চরিত্রবান্; কিন্তু বড় গোঁড়া। এই

নীলমাণিক দেখিল, তাহার ভগিনীর আচার-শুদ্ধতার বাড়বাড়ি শুধু তাহারই একচেটিয়া নয়—সংসারে সেরূপ দৃষ্টান্ত খুঁজিলে আরও মেলে। রাজা বাহাদুরের জ্ঞাতি-ভাই রাজচন্দ্র রায় খুব অবস্থাপন্ন লোক। তিনি আচার-শুদ্ধতায় রাজাকেও হারাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার বাড়ীতে কোন ব্যক্তির মুখে কি হাতে আঙ্গুল ঠেকাইলে অমনই তাঁহাকে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। যদি কোন ভদ্র লোক তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন ও পানের খিলিটা পাঁচ সাত ইঞ্চি দূর হইতে ছুড়িয়া মুখে নিক্ষেপ না করিয়া, হাত-মুখে ঠেকাইয়া খান, রাজচন্দ্রবাবু তখন ভদ্রতার অনুরোধে কিছু বলেন না; কিন্তু সেই ব্যক্তি চলিয়া গেলে অমনই গোময়ের জল দিয়া ভাল ভাল গালিচা-দুলিচা ও খাট-বিছানা ধুইয়া ফেলা হয়। রান্না-ঘরের নিকট কোন কুকুর গেলে সমস্ত পক্ক-দ্রব্য দূরে ফেলাইবার হুকুম হয়। নিমন্ত্রণ বা উৎসবের দিন শত শত টাকার খাবারের

জিনিষ এই ভাবে নষ্ট করা হয়—কেহ যাইয়া বলিলেই হয়—'হুজুর, দেখিতে পাইলাম, ও পাড়ার ভেলো কুকুরটা রান্নাঘরের দেয়ালে লেজ ঠেকাইয়া আছে।' যদি কোন বড় সাহেবের সঙ্গে রাজচন্দ্র বাবু নিতান্ত দায়ে ঠেকিয়া দেখা করিতে যান, তাহা হইলে করমর্দ্দনরূপ বিপদে একেবারে আভিভূত হইয়া পড়েন; বহুবার স্নান করার পর পঞ্চগব্য দিয়া হাত শোধন করা হয়। রাজা বাহাদুর তাঁহার জ্ঞাতি-ভ্রাতার এই চরিত্র হিন্দুধর্ম্মের আদর্শস্থানীয় বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গোঁড়ামি সত্ত্বেও রাজা দানশীল, গরীব-দুঃখীর মা-বাপ, রাজধানীর সর্ব্ব-বিধ উন্নতিকল্পে সচেষ্ট এবং লোকহিতকর সমস্ত কার্য্যের জন্য তাঁহার ভাণ্ডার উন্মুক্ত।

সহরতলীতে ও বড় বড় নগরে ব্রাহ্মণগণ অনেক সময় বেশ উদারভাবে অপরাপর শ্রেণীর সঙ্গে মেলা-মেশা করিয়া থাকেন। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে

ব্রাহ্মণ ও অপরাপর জাতির সঙ্গে সেরূপ উৎকট পার্থক্য আর নাই। কিন্তু এই গ্রামের ব্রাহ্মণ-সমাজ অনেকটা সিন্ধবাদের গল্পের বৃদ্ধের মত অপরাপর জাতির স্কন্ধে এরূপ ভাবে চাপিয়া আছেন যে, তাহাদের শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। নীলমাণিক বাজারে যাইয়া দেখিল, এক ব্রাহ্মণ মাছ কিনিতে গিয়াছেন, জেলে ওজনের ঢের বেশী মাছ তাঁহাকে দিয়াছে, পাল্লাটা একদিকে একবারে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, কারণ, সেই ব্রাহ্মণ ঐ মাছ খাইয়া জেলের সাত পুরুষ উদ্ধার করিয়া দিবেন, এই তাহার বিশ্বাস। কিন্তু মৎস্য-ক্রেতা রাজীব কাঞ্জিলাল তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া, চুপড়ি হইতে আরও এক থাবা মাছ উঠাইবার সময় জেলে হাত ধরিয়া বলিল—"বাবা ঠাকুর, আর নয়।" অমনই ব্রাহ্মণের ক্রোধ হইল—সে মাছগুলি ত লইলেনই, তাহা ছাড়া জেলের গালে ঠাস্ করিয়া একটা চড় কসাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণের ক্রোধে সমুদ্রের জল পর্য্যন্ত

শোনা হইয়াছে, পরীক্ষিতের মত রাজাকে সাপে খাইয়াছে—জেলে কোন্ ছার। নীলমাণিক দেখিল, তরিতরকারীর দোকানে—ফলের দোকানে সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণগণ এইরূপ অত্যাচার করিতেছেন। এক কৈবর্ত্তের প্রাপ্তবয়স্কা কন্যাকে রায়পুরের উধোমুখোর সাতাশ পুরুষের অধস্তন সন্তান রাম মুখুয্যে জোর করিয়া টানিয়া বাহির করাতে সে ফৌজদারীতে নালিস রুজু করিয়াছিল। তখনই গ্রামে রব উঠিল—'কি ? ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে নালিস ? ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে নালিস ? এ হচ্ছে কি না সাক্ষাৎ কলিকাল !' সেই গ্রামের লোকদের সংস্কার—ব্রাহ্মণের অকার্য্য কিছুই নাই—শাস্ত্র তাহাদিগকে সকল পাপ করিতেই ছাড়পত্র দিয়াছে ; অপরে তুড়ি না মারিয়া একটি হাই তুলিলেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। নীলমাণিক একদিন দেখিল, পাড়ার রাস্তায় একটি সদ্গোপ-বংশীয়া বৃদ্ধা রমণী পর্ব্বতপ্রমাণ একটা শাক-সব্জীর বাজ্রা মাথায় লইয়া বাজারে যাইতেছে। শ্রীচরণ চক্র-

বর্ত্তী পথে দাঁড়াইয়া শীতকালের রৌদ্র পোহাইতেছিল, চক্রবর্ত্তী সরিয়া না দাঁড়াইলে সেই স্ত্রীলোকটিকে ব্রাহ্মণের ছায়া মাড়াইয়া যাইতে হয়; গুরু বোঝা মাথায় করিয়া বৃদ্ধা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে, তথাপি শ্রীচরণ একটু চরণ নাড়িয়া দাঁড়াইতেছেন না,—যেন বৃদ্ধাকে আক্কেল দিবার জন্যই তিনি সেইখানে স্থাণুবৎ স্থির হইয়া আছেন। নীলমাণিক রাজচন্দ্র বাবুর আচারের বহর দেখিয়া হিন্দুধর্ম্মের একটা উৎকট রূপ দেখিয়াছিল, আর এই নিত্য-অনুষ্ঠিত দুর্নীতি দেখিয়া বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের আর একটা উৎকট দিক্ দেখিল।

রায়পুরের ব্রাহ্মণগণ অপর কোন জাতির সামাজিক উন্নতি একেবারেই সহ্য করিতে পারেন না; তাহা-দিগকে খর্ব্ব করিতে পারিলেই যেন বড় হন। এক দিন একজন বড় ঘরের কায়স্থ কোন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার বাড়ীতে আহার করেন, আহার সমাপন করিয়া সকড়িটাও তাঁহাকেই পরিষ্কার

করিতে হইল। কৈবর্ত্ত ও শূদ্র চাকরগণকে ব্রাহ্মণগণ উঠাইয়া রাখিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কোন জাতির সকৃড়ি পরিষ্কার করিতে নাই। একদিন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট রায়পুরে একটা জনহিতকর সভাস্থাপন করিয়া কোন গণ্য-মান্য শূদ্রজাতীয় লোককে সভাপতির পদে নিয়োগ করিয়া চলিয়া যান; ব্রাহ্মণগণ তখনই সেই সভা হইতে এই বলিয়া উঠিয়া যান,—"এটা হচ্ছে গেরাবু খেলা —এখানে গোলাম রাজা—এখানে আমাদের থাকা হবে না।" একদিকে শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণ-শক্তির প্রতি অসীম ভক্তিজনিত সংস্কার, অপরদিকে এই নিত্যকার লাঞ্ছনা সমস্ত জাতিকে যেন অবনতির গভীর গহ্বরে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। রাজবাড়ী হইতে ব্রাহ্মণ্য ডঙ্কা ক্রমাগত বাজিয়া সেই দেশের সমস্ত লোককে ব্রাহ্মণ এবং ঈশ্বর—দুই-ই একার্থ-প্রতিপাদক প্রমাণ করিয়াছিল। যাঁহারা একদা ত্যাগ-মহিমায় দেবতার স্থানে আসীন ছিলেন, ধনকুবেরগণের ঐশ্বর্য্যকে তৃণবৎ উপেক্ষণীয় মনে করিয়া,

যাঁহারা পর্ণকুটীরে বাস করিয়া দারিদ্রের অভিমানে ও আচার-বিশুদ্ধতায় লোক-শ্রদ্ধার তুঙ্গশৃঙ্গে উঠিয়াছিলেন—আজ তাঁহাদের বংশধরগণ ত্যাগের মহিমা হারাইয়া হীন হইয়া গিয়াছেন—টিপু সুলতানের বংশধর যেন দরজীর কার্য্য করিতেছেন—অথচ গায়ের জোরে পূর্ব্ব-পুরুষগণের অর্জ্জিত সম্মানের উত্তরাধিকারী হইবেন—এই মনে করিতেছেন। ইহাই হিন্দু-ধর্ম্মের অপর এক বিকট দৃশ্য। তার পরে সেই গ্রামে 'সাহা' উপাধি-ধারী বণিককুল শৌণ্ডিককে প্রাণ-পণে ঘৃণা করিতেছে। সদ্গোপগণ গয়লাজাতি হইতে আপনাদিগকে বহু উচ্চ মনে করিয়া গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিতেছে, কৈবর্ত্তগণ পদ্মরাজদিগকে ঘৃণা করিতেছে এবং সমস্ত জাতি মিলিত হইয়া নমঃশূদ্রকে পদ-দলিত করিয়া মারিতে চেষ্টা করিতেছে। হায়! সমাজে আর প্রীতির বন্ধন কোথায়? এককালে হয় ত ছিল; কিন্তু এখন বিজাতীয় ঘৃণা সমস্ত সমাজকে কাটিয়া খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া

ফেলিতেছে—এই খণ্ড খণ্ড জুড়িয়া কে এক অখণ্ড জাতি সৃষ্টি করিবে?

একদিন নীলমাণিক গৌর-চন্দ্রিকায় নরহরির কৃত একটি পদ গাহিল। পদকর্ত্তা বলিতেছেন—গৌরপ্রেমে সকলেই ডুবিল, কেবল এই নরহরি ডুবিল না; কারণ, সে কুলশীল ও জাত্যভিমানের উচ্চ-ডাঙ্গায় বসিয়াছিল—সেই উচ্চ-ডাঙ্গা গৌরপ্রেমবন্যা ভাসাইতে পারে নাই।

গানটি যখন গাওয়া হয়, তখন আসরে সকলেই বাহবা দিয়াছিলেন—সকলেরই ভাল লাগিয়াছিল। কিন্তু গান ভাঙ্গার পর কুলশীল ও জাত্যভিমানের প্রতি এই কটাক্ষ ব্রাহ্মণ শ্রোতৃদের মধ্যে কাহারও কাহারও ভাল লাগিল না। তাঁহাদের একজন গোপনে বলিলেন—"দেখ্‌লে কীর্ত্তনীয়া বেটার সাহস? এ সকল নেড়ানেড়ী দলের লোক—শক্তি আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইনি দুর্ব্বার ডগা দিয়া প্রাচীর ভাঙ্‌বেন। এই কুলশীল জাত্যাভিমানের প্রতি ইঙ্গিতের অর্থ ত বুঝিয়াছ ভায়া? ইহার সঙ্গে

ব্রাহ্মণকে এক থালায় বসিয়া খাইতে হইবে—তবেই গৌর-ভক্তি মিলিবে!" কথাটা বলা হইয়াছিল শশিপদ গাঙ্গুলীর নিকট; তিনি অমনই বক্তা হরিশ গাঙ্গুলীকে বলিলেন—ব্রাহ্মণগণ উঁহার সঙ্গে এক থালায় খাইলেই যে কি দোষ হয়, তা' ত আমি বুঝি না। মহাভারতে আছে, ব্রাহ্মণ-গণের পক্ষে নাপিতান্ন প্রশস্ত। নানা অস্থানে কুস্থানে যদি—হরিশ গাঙ্গুলী, তুমি না খাইয়া বেড়াইতে, তবে না হয় তোমার মুখে এ কথা শোভা পাইত! গণিকার লালা যাহার ওষ্ঠ হইতে এখনও মিলায় নাই, তাহার একজন সাধুর প্রতি এতটা আক্রোশের কারণ কি?"

তাহার চরিত্রের যে স্থানটি দুর্ব্বল, তাহার উপর নিষ্ঠাপূর্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এত বড় একটা ঘা দেওয়াতে সে সাহস করিয়া কথাটা আর বাড়াইতে পারিল না' কিন্তু বিষম রাগিয়া পরদিন সমস্ত স্থানে নীলমাণিকের গানের কুটার্থ করিতে লাগিল।

১৪

দশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে নীলমাণিক আর নারায়ণপুরে যাঁয় নাই। সে চিন্তা-দিদিকে কাশী যাইয়া দেখিয়া আসিবে—পারে ত তাহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিবে,—ইহাও মনে মনে করিতেছিল। সে মাসে মাসে তাহাকে অনেক টাকা পাঠাইত। কাশীতে থাকিয়া পুণ্য-কার্য্যে চিন্তা তাহা ব্যয় করিবেন, ইহাই তাহার অভিপ্রায় ছিল। নীলমাণিক নিজে বিস্তর উপার্জ্জন করিত—তাহার কোন হিসাব ছিল না, সেগুলি তাহার দলের লোকেরা অবাধে লুঠ করিত—তথাপি অনেক টাকা জমিয়া গিয়াছিল। আসরে মহিলারা প্রায়ই তাহাকে সোনার বালা, তাগা, চুড়ী প্রভৃতি অলঙ্কার "পেলা" দিতেন, সেগুলিও অনেক জমিয়া গিয়াছিল। সেই অলঙ্কারগুলি সে মায়ের দান বলিয়া পবিত্র মনে করিত।

এ দিকে খবর আসিল, চিন্তাদিদির জ্বর হইয়াছে। তাহার অব্যবহিত পরেই আবার খবর আসিল—তাহার দেহত্যাগ হইয়াছে। সুতরাং নীলমাণিকের সঙ্গে আর তাহার দেখা হইল না। কাশীর বিস্তারিত পত্রে জানিল, ইদানীং চিন্তা দিদির মাথাটা কতক খারাপ হইয়া গিয়াছিল। কোন বিধবার রান্নাঘরে পিপীলিকা—যাহাদের গতিবিধি অবারিত ও সর্ব্বত্র—না ঢোকে, কাকগণ যাহাতে উচ্ছিষ্ট মুখে করিয়া কোন গৃহ হইতে গৃহান্তরে না যায়—এজন্য যাঁহারা তাহার সাধু উদ্দেশ্যের মর্ম্মী, তাঁহাদের বাড়ীতে সে অনেক চাকর ও দাসী নিজ ব্যয়ে নিযুক্ত রাখিয়াছিল। নীলমাণিকের প্রেরিত অর্থের এই ভাবে কতকটা খরচ হইত। যাহা হউক, ভগিনীর জন্য তাহার প্রাণে নিদারুণ কষ্ট হইল। পৃথিবীতে এখন তাহার আপন বলিতে আর কেহ রহিল না।

একদিন নীলমাণিক পথে যাইতে যাইতে দেখিল, একটি মেথরাণী গ্রামের বাহিরে স্বীয় কুটীর-পার্শ্বে বসিয়া

কাঁদিতেছে। তাহার বয়স অধিক নহে; কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল—তাহার স্বামী মারা গিয়াছে, তাহাকে পোড়াইবার লোক নাই—তাহার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী দেশে গিয়াছে। মেথর-মড়া, কেহ ছুঁইবে না। সে এই অবস্থায় কি করিবে? দুই দিনে মড়া পচিয়া উঠিয়াছে, এই দুই দিন মেথরাণী নিরম্বু উপবাস করিয়াছে। কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া নীলমাণিক মেথরাণীর সাহায্যে শবটা খালের ধারে তুলিয়া আনিল ও কাঠ সংগ্রহ করিয়া উহা পোড়াইয়া আসিয়া স্নান-আহ্নিক সমাপন পূর্ব্বক সেই স্ত্রীলোকটিকে আশাতীত অর্থ পাঠাইয়া দিল। সন্ধ্যাকালে শশী বাবু তাহার বাড়ীতে আসিলে, তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলিল। শশীবাবু বলিলেন—"কাজ করেছ ভাল, কিন্তু এ পোড়া নিষ্কর্ম্মার দেশে ভাল কাজ বুঝিবার লোক নাই। ইহার জন্য বেগ না পাইতে হয়!"

কিন্তু এজন্য নীলমাণিকের বিপদের অন্ত রহিল না।

তাহার বিরুদ্ধে হরিশ গাঙ্গুলী-প্রমুখ কয়েকজন লোক ইতিপূর্ব্বে নানাকথা প্রচার করিয়া একটা ষড়্‌যন্ত্রের বীজ বপন করিয়া রাখিয়াছিল। এই ঘটনাতে তাহারা খুঁব সুবিধা পাইল। রাজা বাহাদুরের কানে এই কথা উঠিল। তিনি নীলমাণিককে ডাকাইয়া আনিলেন; কিন্তু প্রাসাদে ঢুকিতে না দিয়া বাহিরে একটা জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন।

"নীলমাণিক, তুমি মেথরের শব পোড়াইয়াছ?"

"হাঁ, হুজুর!"

"এরূপ জাতনাশা কাজ কেন কর্‌লে?"

"মড়াটা পচিয়া উঠিতেছিল, পথে যাইতে পথিকেরা দুর্গন্ধ পাইত।"

"আমি অপর জায়গা হইতে মেথর আনাইবার জন্য বন্দোবস্ত করিতেছিলাম—তোমার এতটুকু তর সহিল না?"

"তা আমি জানিতাম না।"

"লোকে বলে, তুমি মেথরাণীর চাঁদপানা মুখখানি দেখিয়া ভুলেছিলে!"

"হায় গোবিন্দ!—ভুলেছিলাম বই কি?"

"কি, এত বড় স্পর্দ্ধা! আমার মুখের সাম্‌নে মেথরাণী দেখে ভুলিবার গর্ব্ব!"

"মহারাজ বাহাদুর! স্পর্দ্ধা নহে। আমি সত্যই ভুলেছিলাম—আমাদের মা মাসী যে কাজ কর্‌তে ঘৃণা করেন, সেই কাজ এদের দিয়া করাইয়া লই এবং প্রতিদানে ঘৃণা দিয়া থাকি—এই সেবার পরিবর্ত্তে উহাদের প্রাণান্ত বিপদেও কি আমরা এগোব না? সমাজ তাহাদের নিকট যে উৎকট সেবা আদায় করিয়া লয়—তাহা স্মরণ করিয়া ভুলিয়াছিলাম। তাহারা আমাদেরই একজন এবং বিনা অপরাধে পুরুষানুক্রমে দণ্ডিত—এই ভাবিয়া ভুলিয়াছিলাম। আর একটা কথা মনে করিয়া ভুলিয়াছিলাম—যখন দেহ হইতে প্রাণ বাহির হইয়া যায়,

তখন ত আর ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদ থাকে না—শবের কি জাত আছে?"

"তুমি যে দ্বিতীয় যাজ্ঞবল্ক্য হইয়া নীতি শাস্ত্র তৈয়ারী করূচ দেখ্ছি। ব্রাহ্মণগণ তোমার মুখে স্মৃতির বিচার শুন্‌বেন না। তুমি যে অতিশয় ঘোর দুষ্কর্ম্ম করেছ তজ্জন্য আমি তোমাকে দণ্ডিত কর্‌ব। এ স্থানে তোমার কীর্ত্তন আর কোন বাড়ীতে হবে না। মেথরের মুখে কেহ হরিনাম শুন্‌বে না।"

"হরি যদি সত্যই বড় হন, তবে মেথর ছোট থাক্‌বে না।"

"তোমাকে আমি যে বাড়ীখানি দিয়াছি, তাহাতেই তুমি থাক গিয়া—সে বাড়ীতে এ দেশের কোন ব্রাহ্মণ পায়ের ধূলা আর দেবেন না।"

"মহারাজ, সে বাড়ীতে আমার কোন প্রয়োজন নাই। মহারাজ থাকতে বল্‌ছেন, থাক্‌ব। কিন্তু আমি সে বাড়ীর অধিকার চাই না।"

এই বলিয়া দূর হইতে রাজাকে প্রণাম করিয়া সে বাড়ীতে চলিয়া আসিল ; একবার ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, রাজা বাহাদুরের লোকজন তাহার পথে পথে গোবর-ছড়া দিতেছে।

১৫

সেইদিন সন্ধ্যাকালে নীলমাণিক বাড়ীতে বসিয়া আছে, তাহার দলের তিনকড়ি আসিয়া বলিল—"যোগেশ-বাবুর বাড়ীতে যে কীর্ত্তনের বায়না হইয়াছিল—তাহা ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছে।" এই বলিতে না বলিতেই শ্রীধর আসিয়া বলিল, "চাটুর্য্যেরা আসিয়া বায়না ফেরৎ লইয়া গেল।" শ্রীধর নীলমাণিকের কীর্ত্তনে খোল বাজায়। নীলমাণিক কিছু বলিল না ; সে অর্থলোভী নহে—তাহার মুখের হরিনাম ব্রাহ্মণেরা শুনিবেন না, ভাবিতে তাহার বুকে শেল বিদ্ধ হইল। "হায় রাধাবল্লভ! আমার সংসারে আর কি রাখিয়াছ ? তোমার দুটি নাম করিয়া বেড়াই—তা যদি না পারি, তবে কোথায় যাব ?"

শ্রীধর পুনরায় বলিল, "বামুন-বাড়ীর চাকরেরা এ বাড়ীতে ঢুক্‌বে না—ধোবা আসিয়া দূর হইতে আমাদের কাপড় ফিরাইয়া দিয়া গিয়াছে।"

নীলমাণিক বলিল, "ভয় কি ভাই? যখন নিজের দেশই ছাড়িয়া আসিয়াছি, তখন না হয় এ দেশ ছাড়িয়া যাইব। কিন্তু বড় দুঃখ এই হয় যে, কাহারও ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট করি নাই, তবে কেন রাধাবল্লভ একটা বিবাদের মুখোস পরাইয়া আমাকে এ দেশ-ত্যাগী করাবেন!" এই সময় শশিপদ গাঙ্গুলী আসিয়া উপস্থিত হইলেন—এবং সস্মিত-মুখে বলিলেন—"কি ভায়া মাণিক, এতটা বিমর্ষ হইয়া ব'সে ব'সে কি ভাব্‌ছ?" নীলমাণিক কাঁদ-কাঁদ স্বরে শশী বাবুর পায়ের উপর পড়িয়া বলিল—"আমি কি করেছি কি না করেছি, রাধাবল্লভ জানেন। এ দেশের ব্রাহ্মণেরা আমার মুখে হরি নাম শুন্‌বেন না, আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলা দেবেন না। রাজা-বাহাদুরের ইচ্ছা নয়, আমি এখানে থাকি। আমি

হয় ত শীঘ্রই বৃন্দাবন চ'লে যাব। আপনাকে পিতার ন্যায় ভক্তি ক'রে থাকি। এতদিন এখানে থেকে কতকটা মায়ায় আবদ্ধ হ'য়ে পড়েছি, এদেশ ছেড়ে যেতে কষ্ট বোধ হচ্ছে। আপনি আমার বাড়ীতে এলেন, হয় ত এজন্য সামাজিক নিগ্রহ ভোগ কর্ত্তে হবে। কেন অনর্থক বিপদ্ ডেকে আন্‌ছেন?" শশিপদ বাবু বলিলেন "তারা আমাকে বন্ধ কর্‌বে ব'লে শাসাচ্ছে, আমি থোড়াই কেয়ার করি। এখন ও পারের মহাবাণী শোনা যাচ্চে—এ পারের হৈ হৈ রৈ রৈ আর ভাল লাগ্‌ছে না। চিরকাল এই বামনাই ফলায়ে কি করলুম, বুঝিতে পারি না—কেবল পরকে হেঁট করবার জন্য এবং সকলের টিকির উপর ব'সে থাকিবার যোগাড়—এই না? যে সকল লোক তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়েছে, তারা মনুষ্যত্বের হিসাবে তোমার সঙ্গে কথা বল্‌বার যোগ্য নহে, তাদের যৌবন, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বয়সের ঢের কীর্ত্তি আমার জানা আছে—সে

সকল কথা বল্‌বার দরকার নাই। তোমার মতন লোকের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য আমি রায়পুরের বড়লোকের সমাজ ছেড়ে দিতে পারি। তুমি যদি বৃন্দাবন যাও, তবে যদি লইয়া যাও ভাই, আমিও তোমার সঙ্গে যেতে রাজি আছি।” এমন সময় একজন লোক আসিয়া খবর দিল, একটি বৃদ্ধ খোঁড়া ব্যক্তি ও অপর একটি লোক নীলমাণিকের সঙ্গে দেখা করিতে চান।

শশী বাবুর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে নীলমাণিকের চক্ষু আর্দ্র হইয়াছিল; সেই আর্দ্র-চক্ষু মুছিতে মুছিতে সে নীচে নামিয়া আসিল। সিঁড়ির সম্মুখে সে যাহাকে দেখিল, তাহাতে তাহার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইল ও চক্ষু পুনরায় আর্দ্র হইল—এ তাহার গুরু গোবর্দ্ধন সাহা। সে জাত্যভিমান ভুলিয়া গুরুকে গড় করিল এবং তাহার পার্শ্বে নলিনবিহারীকে দেখিয়া সাশ্রুচক্ষে বলিল—“কি ভাগ্যি, নলিন্, তোর সঙ্গে আবার এ জীবনে দেখা হোল!” নলিন নারাণপুরবাসী, তাহার খেলার সাথী।

গোবর্দ্ধন বলিল, "কার্য্যবশতঃ নলিন আর আমি এ দেশে এসেছিলাম। তোমার সঙ্গে বহুদিন দেখা হয় নাই। ছোট বেলা কত মা'রধর করেছি, এখন তোমার জগৎ-জোড়া নাম, তুমি কি মনে করবে ভেবে ভয়ে ভয়ে খবর দিয়েছি।"

নীলমাণিক গুরু এবং ছোটবেলার খেলার সাথীকে পাইয়া মনে করিল, নিজের গ্রামটি তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অদৃষ্টের কোন দুর্জ্ঞেয় বিধানে এই গুরু গোবর্দ্ধন নীলমাণিকের জীবনের দুইটি সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হইয়াছিল,—তাহার অজ্ঞাত-সারে এই দুইবারই সে মাণিকের জীবনে এক একটা পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দিয়াছে। শৈশব সংক্রান্ত নানা বিষয়ের আলাপ চলিল। নলিন বলিল, "নীলা, ছোট বেলা যখন তুই আম-বাগানে কোকিলের সঙ্গে সঙ্গে কুহু রবে চীৎকার ক'রে উঠ্‌তিস্, তখন চিন্তাদিদি বল্‌ত—'নীলার স্বর কোকিলের ডাকের চাইতেও মিষ্টি' আজ সমস্ত বাঙ্গলা মুলুকটা যে চিন্তা-

দিদির সেই কথা বল্‌বে, তাহা কখনও ভাবিনি।" আহারান্তে নীলমাণিক তাহাদিগকে তথায় আর কয়েকটা দিন থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিল। তাহারা কিছুতেই রহিল না—বিশেষ নলিনের বড় জরুরী কাজ; সেই দিনই রওনা না হইলে নয়। গোবর্দ্ধন বলিল,—"তুমি কি আর দেশে যাবে না?" হঠাৎ নীলমাণিক বলিয়া ফেলিল—"আপনারা যান—আমি যাচ্ছি।"

কিন্তু কথাটি বলার পর নীলমাণিক বুঝিল, এ কথা সে ইচ্ছা করিয়া বলে নাই—যেন কোন অজ্ঞাত শক্তি তাহার মুখ হইতে গুরুর নিকট এই প্রতিশ্রুতি-বাক্য বাহির করিয়াছে। সেই শক্তির উপর নির্ভর করিয়া সে মনে মনে ঠিক করিল, সে আবার দেশে যাইবে।

সে শশিপদ বাবুকে বলিল—"আমি বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে এ দেশের অবস্থা ভাল ক'রে বুঝ্‌তে পেরেছি। এ দেশ এখন কাজ কর্‌বার শক্তি হারিয়েছে। নিষ্কর্ম্মা থাক্‌লে লোকে তামসিক ভাব আশ্রয়

করে, এজন্য এ দেশ হিংসা, দ্বেষ ও নিন্দাবাদের স্থান হ'য়ে উঠেছে। এত ঘৃণা ও বিদ্বেষ ল'য়ে এ জাতি বড় হবে কি ক'রে জানি না। স্ত্রীলোকের প্রাচীন আদর্শ ভেঙ্গে গেছে—তাঁরা একটা পরিবর্ত্তনের মুখে এসে দাঁড়ায়েছেন। কিন্তু এ দেশে ভক্তির ফল্গু নদী ভিতরে ভিতরে বয়ে যাচ্ছে—সেই প্রবাহিণী পতিতকে পাবন করবেন। কার দ্বারা তা হ'বে, জানি না, কিন্তু আমার মনে হয়, কেহ আস্‌ছেন, যিনি যুগোপযোগী কর্ম্মের সাধনা শিখায়ে শতধা চূর্ণ হীরার সদৃশ এই সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মকে এক করবেন। আমাদের প্রদীপ জ্বেলে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় বসে থাকতে হবে, তাঁর জন্য তপস্যা করতে হবে; তিনি যে কবে আস্‌বেন জানি না, কিন্তু নহবতের উচ্চ বাদ্য শোনা যাচ্ছে, শাঁখ বাজ্‌ছে ও মন্দিরার মধুর ধ্বনি স্বপ্নে শুনে মনে হচ্ছে যেন বর আস্‌ছেন, যেন তপঃসিদ্ধির সোনামুকুট প'রে, স্বীয় মোহিনী শক্তির জয়মালা প'রে, তিনি এসে স্বীয় আসনে

বস্‌বেন, তখন জাতীয় মিলনের ঘণ্টা বাজ্‌বে ও মন্ত্র উচ্চারিত হইবে; সেই মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর পাগড়ি ও মুসলমানের টুপি এক চিহ্ন ধারণ করে আত্মপরিচয় দিবে এবং এক প্রীতির মূল্যে বিকোবে। আর একটা কথা, শশিপদ বাবু, আমি শীঘ্র দেশে যাচ্ছি। আপনি এখানে যদি আমার জন্ত কোনরূপ বিপন্ন হন, তবে চলুন, আমার সঙ্গে আমাদের দেশে।"

শশী বাবু বলিলেন—"তোমার সঙ্গে আমি সর্ব্বদাই যেতে প্রস্তুত, কিন্তু এখন নহে। আমি বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া পালাব না। বিপদ্ কিরূপ, না বুঝিয়া, তার শিঙ্গে নাড়া না দিয়ে যাচ্ছি না।"

১৬

যে দিন গোবর্দ্ধন ও নলিন দেশে ফিরিয়া গেল, সেই দিন নীলমাণিক তাহার দলটি তাহাদের সঙ্গে নারাণপুরে পাঠাইয়া দিল। তার পর শশিপদ বাবুর হস্তে টাকা-কড়ি ও

বাড়ীর ভার দিয়া সে একা দেশাভিমুখে যাত্রা করিল। সে কোন্ দেশে যাইতেছে? সেখানে না তাহার মাতা চারটা বাজিয়া গেলে রোজ দুধের বাটি হাতে করিয়া পাঠশালা হইতে ফিরিবার পথে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতেন এবং জিহ্বার অমৃতস্বরূপ অন্ন-ব্যঞ্জন ও নানা উপাদেয় মিষ্টান্ন নিত্য নিত্য তাহাকে রাঁধিয়া খাওয়াইতেন! যে কাঁসার থালাখানি ও বাটিগুলিতে সেই খাদ্যের পরিবেশন হইত—তাহাদের আকৃতি তাহার মনে আছে; তাহার চক্ষে এমন সুন্দর থালা ও বাটি আর নাই, অন্নপূর্ণার করস্পর্শে তাহাদের স্মৃতি তাহার নিকট হীরা হইতেও উজ্জ্বল হইয়া আছে। নীলমাণিক সেইখানে যাইতেছে—যেখানে তাহার বাবা শীতকালে তাহার জন্য রামা-চাকরের সঙ্গে তিলা ও কদমা পাঠাইতেন ও তাহার ভগিনী 'মুক্তালতাবলী' ও 'রামায়ণ' পড়িয়া শুনাইতেন। সেখানে সে কাহার গলায় মাল্য দোলাইতে যাইয়া তাহার নাগাল না পাইয়া দিন-রাত পাগলের মত

কাটাইয়াছে! সেখানে না তাহার প্রাণের দেবতা রাধা-বল্লভ এখনও পাষাণ হইয়া আছেন! সে দেশ কেমন করিয়া আবার দেখিবে—সেখানে মায়ের কাছে না বসিয়া সে ভাত খাইবে কেমন করিয়া? সে দেশে কাহার চন্দ্রমুখ-খানি সে শয্যাগৃহে ছায়ার ন্যায় সরিয়া যাইতে দেখিবে? সে যে তাহার জীবন পাওয়ার দেশ—সে যে তাহার সমাধির দেশ! সে দেশের গাছ-পাতার হাওয়া মনে হইলেও যে তাহার দেহ জুড়াইয়া যায়। বিদেশে একক বিছানায় শুইয়া সে রোজই মনে করে—সে সেই দেশের ঘরে মা বাবার মাঝখানে শুইয়া আছে, একবার বাবা তাহার গায়ে হাত বুলাইতেছেন, আর একবার মায়েয় গলা সে নিজে জড়াইয়া ধরিতেছে। সে এখনও মনে করে, সেইখানে তাহার মা বসিয়া রাঁধিতেছেন ও চিন্তা দিদি বসিয়া বই পড়িতেছেন! এই ভুল ভাঙ্গিলে সে বাঁচিবে কি করিয়া?

পথে যাইতে যাইতে তাহার চোখের পাতা বারংবার আর্দ্র হইতে লাগিল।

গো-শকটে কতকদূর যাইয়া সে রেল-গাড়ীর মধ্যশ্রেণীর একখানি কামরায় আসিয়া বসিল। একজন ভদ্রলোক সপরিবারে স্বদেশে যাইতেছেন—তাঁহার সঙ্গে সেখানে আলাপ হইল—উভয়ে স্বদেশে যাইতেছেন—কিন্তু দুয়ের ভাবের কি পার্থক্য! একদিন 'মাথুর' গাহিতে যাইয়া তাহার মূর্চ্ছার পীড়ার সৃষ্টি হইয়াছিল, তিন বৎসর হয়, তাহা সারিয়া গিয়াছিল। আবার বুঝি তাহা হয়। নীলমাণিক বাড়ীর কথা আর মনে ভাবিবে না সংকল্প করিয়া, রেলের পার্শ্বস্থ বিস্তৃত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিল। তখন আবার তাহার মনে হইল, তাহাদের বাগানে সন্ধ্যাকালে কিরূপ নানা পক্ষী কলরব করিয়া বৃক্ষের স্নিগ্ধচ্ছায়ায় আসিয়া আশ্রয় লইত। আবার তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল।

ঢাকায় আসিয়া সে একখানি বড় বজ্‌রা ভাড়া করিল। সেখানে তাহার আগমনের সংবাদ পাইয়া বিশিষ্ট লোকেরা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং

তাহাকে কীর্ত্তন গাহিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তাহার হৃদয় তখন আবেগে ভরা—সেই অবস্থায় কীর্ত্তন গাওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব—সে নানা অজুহাত দিয়া তাঁহাদের অনুরোধ এড়াইল।

সন্ধ্যায় সে নারাণপুরের দিকে নৌকা ছাড়িয়া দিল। একদিকে কানাই, অপর দিকে বংশাই, মধ্যে ধলেশ্বরী। তখন ভাদ্রমাস, নদী ডাঙ্গা চিনিবার যো' নাই, ধান্যক্ষেত্র চিনিবার যো' নাই। সকলের উপর দিয়া বর্ষার রাজ-নিশানের ন্যায় বড় বড় ঢেউ চলিতেছে—রাজনামাঙ্কিত হইয়া উচ্চ নীচ এক হইয়া গিয়াছে। ডাঙ্গা, নদী, বিল, ক্ষেত্ত বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। সাভারের নিকট যেন অকূল সমুদ্র। দপ্তরীর কাটা সাদা কাগজের ন্যায় ধলেশ্বরীর জল ধব্-ধব্ করিতেছে; সাদা রঙের পাখীগুলি আকাশে উড়িতেছে, মনে হইতেছে যেন, ধলেশ্বরীর জল বায়ুর আঘাতে উর্দ্ধে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। এই বিশাল শুভ্র জলরাশির মাঝখানে আসিয়া মাণিক

তাহার হারাণ প্রাণটি ফিরিয়া পাইল। মনে হইল, সে বাল্যকালে যে প্রাণ লইয়া ডিঙ্গী বাহিয়া ধলেশ্বরীর গর্ভে বেড়াইত, আজ তাহার সেই প্রাণ। তেঁতুল-ঝোড়ার নিকট বজ্‌রা আসিয়া রাত্রে নঙ্গর করিয়া রহিল। নীলমাণিক সারারাত্রি বজ্‌রার ছাদের উপর বসিয়া চন্দ্রিকা-বিধৌত ধলেশ্বরীর জল দেখিতে লাগিল—মনে হইল, যেন একটা প্রকাণ্ড সাদা ও উজ্জ্বল হীরকের খনি তাহার চক্ষের সম্মুখে বিস্তারিত রহিয়াছে।

পরদিন প্রাতে অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল; নীলমাণিক যতই নারাণপুরের সন্নিহিত হইল, ততই অধীর হইতে লাগিল। যেখানে মা-বাপের চরণধূলি, তাহার তুল্য তীর্থ কোথায়? সে পার্শ্বের এক গ্রামে বজ্‌রা লাগাইয়া নিজে কতকগুলি রজনীগন্ধা ও গোলাপ সংগ্রহ করিয়া লইল; সেই উপকরণ দিয়া সে তীর্থোত্তম নারায়ণপুরের দর্শনী দিবে।

গ্রামে ঢুকিতেই একজন গয়লার বাড়ী—আহার

নাম ব্রজলাল; ব্রজলাল নীলমাণিকের খেলার সাথী ছিল। সে এখন বেশ অবস্থাপন্ন হইয়াছে; তাহার বাড়ীতে অনেকগুলি টিনের ঘর, গোয়ালে অনেক গরু; বাড়ীটি চাকর-বাকরে পূর্ণ। বৌদ্ধস্তূপের আকৃতি গোলাঘরটি যেন লক্ষ্মীর শ্রীপদ-লাঞ্ছিত।

নীলমাণিক সেই বাড়ীর ঘাটে বজ্‌রা লাগাইল। অত বড় বজ্‌রা বাড়ীর ঘাটে সংলগ্ন দেখিয়া ব্রজলাল ভয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল—উহা এক হয় ইন্‌কাম ট্যাক্স বাবুর, না হয় পুলিসের দারোগার। নীলমাণিক মাঝিদিগকে তাহার নাম গোপন রাখিতে বলিয়া ব্রজলালকে ডাকাইয়া পাঠাইল। ব্রজলাল জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল —"কেন—কি জন্য?" নীলমাণিকের মাঝিরা বলিল— "আমাদের বাবু কা'ল রাত্রে কিছু খান নাই, কিছু দুধ চান।" ব্রজলাল বলিয়া পাঠাইল, দোয়ালেরা বৃষ্টির জন্য তখনও আসে নাই, দুধ দোহা হয় নাই। অনেক ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকির পর ব্রজলাল বজ্‌রায় না আসিয়া

পারিল না; নীলমাণিকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—"এত ডাকাডাকি কেন বাবু? কি চান?" নীলমাণিক বলিল, "কিছু খেতে চাই।" ব্রজলাল বলিল, "এখন আর খেতে কি দিব?" নীলমাণিক বুঝিল, ব্রজলাল তাহাকে চিনিতে পারে নাই। তাহার প্রাণ দুঃখে ফাটিয়া যাইতে লাগিল—জন্মভূমিতে আসিয়া তাহার শৈশবের খেলার সাথীর নিকট এই অভ্যর্থনা! সে বজ্‌রার অপর একটা কামরা হইতে চক্ষু মুছিয়া আসিয়া গদ্গদকণ্ঠে ব্রজলালকে বলিল—"ব্রজা—আমায় খেতে দিলি না, এ জীবনে আর তোর কাছে খেতে চাব না।" তাহার করুণ কণ্ঠের স্বরে ব্রজলাল চমকিয়া উঠিয়া, তাহার মুখের দিকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া, চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"এ কে? নীলমাণিক? আমার প্রাণের ভাই, তোর কত নাম শুনতে পাই—গর্ব্বে আমাদের বুক সাত হাত ফু'লে উঠে।" দুই বন্ধু তখন আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া

রহিল,—মনে হইল, তাহাদের মধ্যে সূচ্যগ্রের ব্যবধানও নাই। তখন থালাপূর্ণ সন্দেশ ও ক্ষীর ব্রজলালের বাড়ী হইতে বজরায় আসিল। বাড়ীর মেয়েরা শাঁখ বাজাইয়া হুলুধ্বনি করিল—নীলমাণিক এত দিন পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। নীলমাণিক ঢাকা হইতে পাত-ক্ষীর ও অমৃতি, রামপালের কলা ও ফতুল্লার চিঁড়ে সঙ্গে আনিয়াছিল। দুই বন্ধু একসঙ্গে থালায় খাইতে বসিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে কত গল্প করিল। ব্রজলাল বলিল, "তোমার মনে আছে নীলা, একদিন রাত্রে আমি, শ্রীধর ও তুমি ঐ বিলটার মধ্যে এই ভাদ্রমাসে নৌকা লইয়া বেড়াতে গিয়েছিলাম। শ্রীধর তামাসা কর্‌বার জন্ত ধাক্কা মেরে তোমাকে জলে ফেলে দিয়েছিল। তার পর তোমাকে আমরা খুঁজে পাই নাই। ঐ ধান-ক্ষেতের মধ্যে তখন গলা-জল; উহাতে নেমে আমরা দুই জনে তোমাকে কত খুঁজলাম, আর ডাক্‌তে ডাক্‌তে আমাদের গলা ভেঙ্গে গেল। কোন সাড়া না পাইয়া

'বোকাটাকে একবারে মেরে ফেল্‌লাম' এই ভাবে অনুতাপ ক'রে সারারাত্রি আমরা জলের উপর কাটালুম। পরদিন প্রাতে ভয়ে ভয়ে তোমাদের বাড়ী গিয়া দেখি, তুমি ঘুমায়ে আছ। জেগে তুমি উঠে আমাদিগকে বল্‌লে—'তোদের উৎপাতে আমি জল সাঁতরায়ে এসে তখনই ঘুমায়ে পড়েছিলাম। নতুবা নৌকায় উঠ্‌লে আবার কি উৎপাত করতিস্‌ তার ঠিকানা কি ?' শ্রীধর তোমার গালে ঠাস্‌ করিয়া একটা চড় মারিল, তুমি এক হাতে চক্ষের জল মুছিয়া আমাদের দুর্গতি শুনিয়া হাসিতে লাগিলে।" এই ভাবের কত কথা চলিতে লাগিল। শেষে ব্রজলাল বলিল, "হাঁ রে নীলমাণিক, তুই এত বড় লোক হয়েছিস্‌—আমাদের কি একবার মনে করিস্‌ না ? তুই যে এত বড় হবি, তা' আমরা কেহ জানতুম না।"

নিজের বাড়ীতে আসিয়া, নীলমাণিক রাধাবল্লভের মন্দিরে আসিয়া বসিয়া পড়িল। তাঁহাকে প্রণাম করিতে

যাইয়া তাহার দুই চক্ষু জলে পূরিয়া আসিল। সে বাগানের প্রত্যেকটি গাছের নিকটে যাইয়া দাঁড়াইল, তাহাদের পত্রপরিশীলন-স্নিগ্ধ বাতাসের স্পর্শে জুড়াইল এবং মনে ভাবিল, এ তার মায়ের অঞ্চলের বাতাস। রাধাবল্লভকে যাইয়া বলিল—'তুমি আছ, আমার মাকে কোথায় পাঠাইয়া দিয়েছ? তাঁহাকে বলিয়া পাঠাও, তোমার নীলমাণিক বাড়ী আসিয়াছে, তিনি যেখানে থাকেন না কেন, সেখান হইতে ছুটিয়া আসিবেন। যমের প্রহরী তাঁহার পথ আগলাইতে পারিবে না।' এই বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। বাড়ীর উঠানের ধূলি মাথায় লইয়া বলিল—"প্রণাম, প্রণাম, শত প্রণাম, এ ধূলি আমার বাপের পায়ের, আমার মায়ের পায়ের, আমার চিন্তা দিদির পায়ের। তাঁরা গেছেন, এই ধূলিতে তাঁদের স্নেহের শত শত কথা লিখে রেখে গেছেন। এই ধূলির সঙ্গে তাঁহাদের পদ-শব্দ শুনিতে পাইতেছি—তাঁহারা বোধ হয় আমাকে দেখিতে আসিতেছেন।"

বৃদ্ধ রামজীবন সরকার তখনও জীবিত। সে বাড়ীর সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ দিতে আসিল। নীলমাণিক বলিল, "আমি তোমার হিসাব-নিকাশ চাই না। যদি হিসাব দেবার কিছু থাকে, তবে রাধাবল্লভকে দিও।"

গ্রামের সমস্ত লোক তাহাকে দেখিতে আসিল। ব্রাহ্মণপাড়া, বৈদ্য-পাড়া, কায়স্থ-পাড়া এবং নবশাখ ও সাহাদের পাড়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহাদের সকলের অনুরোধে নীলমাণিক একদিন গোষ্ঠ গাহিতে আসরে দাঁড়াইল। তাহার দলটি গ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, পূর্ব্বেই ইহা বলা হইয়াছে।

আসরে দাঁড়াইয়া নীলমাণিক গৌরচন্দ্রিকা আরম্ভ করিল। গোরা ধেনুগণকে চালাইবার জন্য বাঁশী বাজাইতেছেন, তাহার অর্থ যাহারা পশুর ন্যায় জীবন-যাপন করিতেছিল—তাহাদিগকে মধুর হরিনাম শুনাইয়া তিনি সোজা পথে আনিতেছেন।

গৌরচন্দ্রিকা শেষ করিয়া যখন নীলমাণিক "আওত সুদামচন্দ্র রঙ্গিয়া পাগড়ি মাথে" গাহিয়া যশোদার আঙ্গিনায় এক একটি করিয়া রাখালকে আনিয়া দাঁড় করাইল, তখন যেন একটা চিত্রশালা সম্মুখে খুলিয়া গেল। কাহারও হাতে পাঁচন-বাড়ি, কাহারও কণ্ঠে স্বর্ণ-হারের সঙ্গে গরু বাঁধিবার দড়ি। এক এক জনের এক এক রূপ। সেই বৃন্দাবনের নিত্যলীলার সহায় রাখালগণের প্রসঙ্গে সকলেরই জীবন-প্রভাতের সাথীদিগকে মনে পড়িয়া গেল। প্রাণ-ঢালা ভালবাসা—ভেদজ্ঞানশূন্য সেই প্রীতিরভাবে সকলেই ভাবিত হইলেন। যশোদা ছাড়িয়া দিবেন না, তাহারাও কৃষ্ণকে ছাড়িয়া যাইবে না। তাহারই কত কথা বলিতে লাগিল, যখন তাহারা নিদ্রায় বিভোর, তখনও স্বপ্নে কানু কানু বলিয়া ডাকিয়া উঠে। তাহাদের মা গঞ্জনা করিয়া বলেন, 'এখানে রাতদুপুরে তোর কানু কোথায়?' তখন তাহারা লজ্জা পাইয়া দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া ফেলে। কানুকে দেখিবার জন্য বনে এক রমণী আসেন,

তাঁহার দশ হাত—তিনি কানুকে কোলে করিয়া রূপে বন আলো করিয়া বসেন। "মা গো, সে কে? তুমি কি তাকে চেন? এমন কত লোক আসে যায়, আমরা এই বৃন্দাবনে কখনও তাদের দেখি নাই। একজন আসেন, তিনি মরালবাহন, তিনি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করেন। আর একজন বীণা হাতে করিয়া কানুর নামগান করেন। কিন্তু সর্ব্বশেষে একজন পাগলের মত আসেন; তাঁহার লম্বিত জটাজূট; এই জটা যদি না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার মুখখানি ঠিক দাদা বলাইএর মত দেখাইত।" দেবগোষ্ঠি বর্ণনা করিয়া নীলমাণিক বলদেবকে আনয়ন করেন। তিনি কানাইএর প্রেমবারুণীপানে মত্ত। সেই প্রেমে তিনি টলিয়া টলিয়া পা ফেলিতেছেন আর ভাবিতেছেন। তাঁহার পাদক্ষেপে ধরিত্রী কাঁপিতেছে, এবং বলিতেছেন, "মা সর্ব্বংসহা, স্থির হও।" পুকুরের পাড়ে দাঁড়াইয়া জলে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া গর্ব্বের সহিত "তুমি কে? আমি কানাইএর দাদা, তোমার

পরিচয় দাও" বলিয়া জোরে আহ্বান করিতেছেন,—"কাক্কা কানাইয়া" বলিয়া ডাকিতেছেন, কারণ, নিত্যানন্দ একটু তোত্‌লা ছিলেন, বলদেবে তাহা আরোপ করা হইয়াছে।

এই শিশু-লীলার মধ্যে সমস্ত প্রলাপ-কাকলী কৃষ্ণের প্রতি পূর্ণ-প্রেমে মধুর হইয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে মধ্যে শ্রোতারা নীলমাণিকের ভাবে একেবারে বিভোর হইয়া পড়িতেছেন। যখন এক হাতে আস্তে আস্তে তুড়ি মারিয়া নীলমাণিক গদ্গদ-কণ্ঠে গাহিল—"যখন মায়ের কোলে শুয়ে থাকি, তখন স্বপনে ভাই কানাই ব'লে ডাকি," তখন সকলে একবারে অধীর হইয়া উঠিলেন। নীলমাণিক নিজের ভাবে বিভোর হইয়া গাহিতেছে—"আমি ভাই কানাই ব'লে ডাকি।" কথা কয়েকটি সামান্য, কিন্তু গায়ক এমনই করুণ-কণ্ঠে, এমনই ভাবে ব্যাকুল হইয়া গাহিল যে, তখন যে যাহাকে ভালবাসিয়াছে—যে যাহাকে হারাইয়াছে—সকলের হৃদয়ে তাহার সাড়া পড়িয়া গেল। "ভাই কানাই ব'লে ডাকি"

অশ্রু-কম্পিত কণ্ঠের স্বর সকল হৃদয় ছুঁইল, সকলকে পাগল করিল, প্রেমে একাগ্র করিল ও বিচ্ছেদে কাতর করিল। জননী হারান-ধনকে মনের ভিতর খুঁজিতে লাগিলেন, রমণী যাহাকে শত ঘা খাইয়া ভুলিতে পারেন নাই, সেই প্রেমাস্পদকে খুঁজিতে লাগিলেন। গায়কের কথার ইঙ্গিতে, হাতের ইঙ্গিতে ব্যাকুল হইয়া যে যার জীবনধনের খোঁজে হৃদয়-বৃন্দাবনে রওনা হইলেন।

গোষ্ঠান্তে যাবট; সুবল এক প্রাসাদের দিকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিয়া দেখাইতেছে—"তুঙ্গ মণিমন্দিরে, বিজলী ঘন সঞ্চরে, মেঘরুচি বসন-পরিধানা" এই গানের সঙ্গে সঙ্গে যেন উপস্থিত লোকবৃন্দ অভ্রংলেহী হর্ম্ম্যশেখরে এক অপূর্ব্ব রূপসীকে দেখিলেন, কারণ, তখন নীলমাণিক তাঁহার হৃদয়ের দেবীকে সুস্পষ্ট দেখিয়া অর্ঘ্য লইয়া অশ্রু-কম্পিত কণ্ঠে গাহিতেছিল।

গান-ভঙ্গের পর সকলে বলিলেন "এ ত সেই বোকা ছেলে নয়! এ দৈববলে অপূর্ব্ব ক্ষমতা

পাইয়াছে। এ কথা ঠিক, তুমি আমি যাহাকে চিনি বলিয়া বৃথা অভিমান করি, তখন তাহার ভিতর যাহা অদৃশ্যভাবে সকলকে ডিঙাইয়া উঠিতেছে, তাহার দিকে লক্ষ্য করিবার সাধনা ও শক্তি সকল সময় আমাদের থাকে না। যাহা নিতান্ত পরিচিত ও সামান্য বলিয়া মনে করি, তাহা কোন দুর্জ্ঞেয় কারণে অপূর্ব্ব ও অসামান্য হইয়া পড়ে।

তার পরদিন তাহার গ্রামের অনেক জায়গা হইতে আহারের নিমন্ত্রণ আসিল। অনেক বড় লোকের আমন্ত্রণ সে না লইয়া তাহার ছোট বেলার পাঠশালার সমপাঠী ও খেলার সঙ্গী বিপিন সাহার বাড়ীতে বজ্‌রায় যাইয়া উপস্থিত হইল। বিপিন তখন একটা খাগের কলম কাটিয়া তাহার ছোট ছেলেটির লেখা-পড়ার আয়োজন করিতেছিল। নীলমাণিককে দেখিয়া সে মাদুর ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল এবং তাহাকে বাহু-পাশে বাঁধিয়া ফেলিল। সে বলিল, "ছোটবেলা তুমি

দা' দিয়া আমার হাতে কোপ মারিয়াছিলে, সেই দাগটি দেখ; এখনও আছে। আমি এই দাগটি লইয়া এখনও সকলের কাছে গর্ব্ব করিয়া থাকি, এটি আমার নীলার চিহ্ন। আমাদের বাড়ীতে যে, চাহিয়া ঝালের নাড়ু খাইতে, তা হয় ত তোমার মনে নাই। তুমি ভাই, এখন বড় লোক, আমি আর তোমাকে কি দিয়া অভ্যর্থনা করিব! বাবা মারা গেলেন, রমাকে শেয়ালে কামড়াইয়া মারিয়া ফেলিল; আমলকীর কারবারটা সিদ্ধি পোদ্দার একবারে মাটী করিয়া ছাড়িয়াছে, এখন ভাই কোন মতে খাইয়া দাইয়া আছি।" নীলমাণিক বলিল, "কই, ঝালের নাড়ু দাও, খাইব।" বিপিন বলিল, "ভাই, গরীব বলিয়া ঠাট্টা করছ নাকি?" "তুমি দিয়াই দেখ না—ঠাট্টা কি সত্য!" বিপিন নীলাকে হাতে ধরিয়া টানিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল—ধব্ধবে উঠানটি অতি পরিষ্কার। ঝক্ঝকে কাঁসার রেকাবে করিয়া অনেকগুলি ঝালের নাড়ু উপস্থিত

করা হইল। সেগুলি নারাণপুরের সাহাদের চমৎকার খাদ্য, তাহারা চা'লের গুঁড়া, লঙ্কা, চিনি ও ঘি এবং অপরাপর মস্‌লা দিয়া এই অপূর্ব্ব নাড়ু প্রস্তুত করে। নীলমাণিকের সঙ্গে কয়েকজন বামুন-কায়েত যুবকও সেই বজ্‌রায় আসিয়াছিল। তাহারা নীলমাণিকের কীর্ত্তন শুনিয়া তাহাকে প্রায় দেবতার ন্যায় মান্য করিত এবং ছায়ার ন্যায় তাহার পাছে পাছে ঘুরিত। রেকাবে অনেকগুলি ঝালের নাড়ু দেখিয়া তাহারা আর লোভ সংবরণ করিতে পারিল না, মুহূর্ত্তমধ্যে নীলমাণিকের সঙ্গে জুটিয়া তাহা সাবাড় করিয়া ফেলিল। এই ব্যাপার সমাধা হইলে একটা রূপার মত পরিষ্কার কাঁসার গেলাস ও ঘটি লইয়া বিপিন একজন ব্রাহ্মণ যুবককে বলিল,—"এইবার যাও ভাই, পুকুর হ'তে জল আনিয়া খাও, ও পাঠ ত আমার দ্বারা হবে না।" নীলমাণিক বলিল,—"কেন হবে না? এবার আমরা তোমাকে জাতে তুলে নেব।" এই বলিয়া বিপিনের

ফুটফুটে সুন্দরী মেয়েটিকে বলিল,—"যা মা লক্ষ্মি, ঘটি ভ'রে কুঁজা হ'তে জল নিয়ে আয় ত?" বিপিন অবাক্ হইয়া রহিল। নীলমাণিক সেই ঘটি হইতে নিজে জল খাইল এবং বামুন-কায়েত যুবকদিগকে খাইতে দিল। তাহারা দ্বিধামাত্র না করিয়া সেই জল খাইল। বিপিনের চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া গেল। নীলমাণিক বলিল,—"দেখ্‌লে, ভাই এদের মনের ভাব! সেকালে যখন সমাজে নিষ্ঠা ছিল, তখন শ্রদ্ধার সহিত ইহারা সকলই মানিয়া লইত। এখন আর ভণ্ডামী কেন? যদি ইহাদিগকে একটু একটু করিয়া চালাইয়া লও, তবে উহারা ব্রাহ্মণের গোলামের গোলাম হইয়া থাকিবে, নতুবা সর্ব্বজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে যে একটা বিদ্রোহের ভাব দেখা যাচ্ছে, তাহা কি ব্রাহ্মণ-সমাজের সংকীর্ণতার ফলে নহে? নিজেরা 'যা তা' করিয়া পরের পথ কতদিন আগ্‌লাইয়া থাকিতে পারিবে? তোমাদের বাপ-খুড়াগণ কখনই এই জল খাইতেন না

এবং এই কার্য্যের অনুমোদনও করিতেন না, তাহা আমি জানি। কিন্তু এখন টিকৃটিকি, গিরগিটি, মেয়েলী ছড়া, এমন কি, মনুর দোহাই দিয়াও আর সমাজের দরজা বন্ধ করিয়া রাখিতে পারা যাবে না। দেখ, এই বাড়ীর উঠানটি,—কয়জন বামুনের বাড়ী এমন পরিষ্কার? ঐ বাড়ীর কাঁসার তৈজস-পত্র কেমন ঝক্ঝকে, যোড়াসাঁকোর কাঁসারীদের দোকানে এ হ'তে উজ্জ্বল কাঁসা আমি দেখি নাই। ইহারা নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব, নিরামিষ খায়। বিপিনের হৃদয়টি এই ত্রিশ বৎসর ভরিয়া আমি চিনিয়াছি, উহা শিশুর চিত্তের ন্যায় অকপট ও সরল। ইহার হাতে জল খেলে কেন জাত যাবে বল দেখি? বৃদ্ধেরা প্রাচীন সংস্কারের কঙ্কাল-স্বরূপ দাঁড়ায়ে থাকবেন; কিন্তু নূতন যে নানা দিক্ দিয়া ঘরের ভিতর ঢুকছে, তা ত রোধ কর্ত্তে পাচ্ছেন না। কেবল এই নিগৃহীত জাতির বেলায় ইঁহারা খাঁড়া হাতে পথ-রোধ করিয়া বসিয়া থাকিবেন। আর সময়ের

সঙ্গে আঁটিয়া উঠ্‌তে পারবেন না, সময় তাঁহাদের টিকি ধরিয়া নূতন পথে আনিতেছে। তাঁহাদের ঘরে সোডা, লেমনেড্‌, বিস্কুট ও কলের জল যে পথ দিয়া ঢুকিতেছে, তাহা তাঁহারা বন্ধ করুন দেখি? সে পথটি, নারিকেলের মধ্যে জল যে উপায়ে ঢোকে, সেইরূপ দুজ্ঞের্য়। আর একটা কথা, সংসারে ঢের দেখিয়াছি, কিন্তু এ বয়সে বুঝিয়াছি, যে আমাকে ভালবাসে, সেই আমার স্বজাতি, যাহারা আমাকে ঘৃণা করে, তাহারা জ্ঞাতি হইলেও পর।"

যুবকের দল এই সকল কথা বুঝিল—তাহাদের অভিভাবকগণের সঙ্গে এ বিষয়ে আর তাহারা একমত হইতে পারিবে না। বিপিনের ছোট্ট মেয়েটির হাতে নীলমাণিক একটা ক্ষুদ্রাকৃতি কাষ্ঠের বাক্স দিল, তাহার ভিতর অনেকগুলি গিনি ছিল; এই সম্বন্ধে বিপিনের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া, নীলমাণিক পুনরায় তাহাকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া বিদায় লইল।

সন্ধ্যাবেলা রাসবিহারী খুড়ো আসিয়া নীলমাণিককে

নিজ বাড়ীতে লইয়া গেলেন। তিনি উঠানে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ যে আমগাছটা দেখ্‌ছ, নীলা, সত্য করিয়া বল ত উহা কাহার?" নীলমাণিক কিছু না ভাবিয়া বলিল—"ওটা ত আপনাদের বলেই মনে হচ্ছে।" রসরাজ সমাদ্দার সেইখানে ছিল। মৃদুস্বরে সে নীলমাণিকের কানের কাছে মুখ রাখিয়া বলিল—"নীলা, ভাল কল্লে না, সাক্ষ্য দিতে হবে।"

তার পর খুড়ো তাঁহার দুঃখের কথা বিস্তারিতভাবে বলিলেন,—"ঐ আমগাছের আমগুলি সবই হারামজাদ রমণী পাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। তাই আমি বাধা দিতে গিয়াছিলাম, এজন্য সে আমাকে ঐ বেলের ডালটা দিয়া প্রহার করিয়াছে। ঐ দেখ, ডালটা আমি চালের বাতায় তুলিয়া রাখিয়াছি। বাবা, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এই মা'র-ধর্ আর সহ্য হয় না। রমণীমোহনটা যত কুলটা স্ত্রী আনিয়া এই গাঁয়ের ঈশানকোণে এক পাড়া বসাইয়াছে, তাহার নাম রাখিয়াছে রমণীপুর—যত কিছু

সৃষ্টির অকাজ, তা সে করে। ও পাড়ার মহিম ঘোষের ছেলে ধনঞ্জয়টা ওর সঙ্গে জুটিয়াছে—সে বেটা মাকে ধরিয়া প্রহার করে ও নয় মাসের গর্ভিণী স্ত্রীটার পেটে এমনই পদাঘাত করেছিল যে, তাহার প্রসব হইয়া গিয়াছিল। এই সকল পাপ আমাকে নাগপাশের মত ঘিরিয়া রাখিয়াছে। বাবা, ইচ্ছা হচ্ছে, আমি তোমার সঙ্গে চলিয়া যাই।"

নীলমাণিক। "আচ্ছা, চলুন না, খুড়ীমাকে সঙ্গে লইয়া চলুন; এই বুড় বয়সে কি আপনার আর ঝগড়া-বিবাদ সাজে?"

রাসবিহারী। "সাজে না, তা' ঠিক,—ইচ্ছা হচ্চে চ'লে যাই, কিন্তু পারি কই? আমি যে দিন বাড়ীখানি ছাড়্‌ব, সেই দিনই রমণীটা আমার উত্তরদিকের বেড়া তুলিয়া সরাইয়া দেবে। এমনই করিয়া তোমরা ছোট-বেলায় গোবর্দ্ধন সাহার পাঠশালায় যেতে—যে পথটায় চল্‌তে, তাহার অর্দ্ধেকটা নিজ বাড়ীর সামিল ক'রে

লইয়াছে। পৈতৃক ভদ্রাসন-ভিটাটি আছে—তা ব্যাটাদের ছেড়ে দি কেমন ক'রে?"

এমন সময়ে রমণী আসিয়া বলিল—"নীলুকাকা, তুমি ওঁর কথা শুন্‌ছ কেন? উনি এত বড় পাষণ্ড যে, আমার সপ্তমাস গর্ভবতী ভ্রাতৃবধূ উহাকে ঢিল ছুঁড়েছে বলিয়া ফৌজদারীতে নালিশ করিয়াছিলেন ও সমন ধরাইতে গিয়াছিলেন। একটু কিছু হইলেই অমনই নালিশ। সেদিন উপর্য্যুপরি বেনামী চিঠি দিয়া পুলিশকে উত্যক্ত করাইয়া আমাদের থানা-তল্লাস করাইয়া এ কি বিপদে না ফেলিয়াছিলেন! ওঁর কীর্ত্তি গ্রামের কে না জানে? আপনি চলুন আমাদের বাড়ীতে।"

তখন একদিকে রমণী নীলমাণিকের এক হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল, অপরদিকে রাসবিহারী খুড়ো অন্য হাত আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—"আমি তোর খুড়ো; আদেশ কর্‌ছি, আমাদের এখানে থাক্‌তেই হবে—ঐ বদমাইসটার কীর্ত্তি আরও শুনে যা।"

নীলমাণিক বহু কষ্টে খুড়োর হাত এড়াইয়া চলিয়া আসিল এবং রমণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "খুড়োর আম-গাছটা হ'তে তোমরা আম পাড়িয়া লইয়াছ কেন ?"

রমণী। "পাড়িয়া লইয়াছি। উনি দিন-রাত আমাদের অনিষ্ট কর্‌বেন, আমাদের গোয়াল-ঘরটা উহাঁর জায়গার এক ইঞ্চির উপর আসিয়া পড়িয়াছে, এই মিথ্যা দাবী করিয়া খুঁটী উঠাইয়া, বেড়া ভাঙ্গিয়া, ঘরটাকে কা'ত করিয়া ফেলিয়াছেন। সে দিন আমি বাড়ী ছিলাম না, তাই রক্ষা। এ ছুতা ও ছুতা ধরিয়া দিনরাত ফৌজদারীতে নালিশ দায়ের কর্‌বেন, ঘরের বউঝিকে পর্য্যন্ত বাদ দিবেন না। তাই আমিও ঐ আমগাছটার উপর দাবী করিয়া রাখিয়াছি।"

এমন সময় এক অবগুণ্ঠনবতী প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক সেখানে উপস্থিত হইয়া নীলাকে ডাকিয়া বলিল, "নীলু, তুই এসেছিস্, বড় ভাল হয়েছে। তোকে সকলেই খাতির করে, আমায় রক্ষা ক'রে যা" এই বলিয়া আঁচলে চক্ষু মুছিয়া,

বলিল, "আমার দেবর শ্রীশ আমার লোহের সিন্দুকের চাবী জোর করিয়া লইয়া, আমার যা কিছু ছিল, সমস্তই দখল করিয়া বসিয়াছে। আমার দুইটি অনাথ ছেলে লইয়া আমি অকূলে ভাসিতেছি। প্রায়ই বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিবার ভয় দেখায়। তুই সালিসী করিয়া আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার ক'রে যা।"

এমন সময় শ্রীশের বিধবা পিসী উগ্রচণ্ডী-মূর্ত্তিতে সেখানে উপস্থিত হইল—তাহার চুলগুলি অতি ছোট করিয়া ছাঁটা; চক্ষু দুটি গোলপানা—তাহা হইতে তখন বিদ্যুদ্‌বর্ষণ হইতেছিল। সে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "নীলা, তোকে বড় বউ কি বলেছে? সকলে একান্নে আছে, বাড়ীর টাকা-কড়িতে রাজুর যতটা অধিকার, শ্রীশেরও তাহাই। রাজু সর্ব্বনেশে চ'লে গেছে—এখন বড় বউ সবটা গ্রাস কর্‌বেন। এও কি হয়? শ্রীশ তাই চাবী লইয়া গেছে, এ ত ন্যায্য কথা—তাই তুই এখানে নালিশ কর্‌তে এসেছিস্? আবার ন্যাকামি করিয়া কান্না?"

এমন সময় সুবল নাপিত নীলুকে খেউরি কর্‌তে ব'সে গেছে—সে ধীরে ধীরে বল্‌তে লাগ্‌ল, "ও পাড়ার চাটুয্যেদের বাড়ীতে ছোটবাবুর ছেলে যতীনে ও সেজ-বাবুর শালা ধীরেনে দাঙ্গা হয়ে গেছে—ধীরেনের মাথা ফেটে রক্ত পড়্‌ছে—দুই পক্ষই ফৌজদারীতে নালিশ কর্‌তে গেছে।"

নীলমাণিক সকলকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা করিয়া, কাহারও অভাব নিজে অর্থ দ্বারা মোচন করিয়া তাড়াতাড়ি বজ্‌রায় যাইয়া উঠিল এবং "মা, জন্মভূমি, তোমার এ কি রূপ দেখাচ্ছ? এমনটি ত ছোট বেলা কখনও দেখিনি" বলিয়া সাশ্রুনেত্রে নিজের ভিটার ধূলি মাথায় লইয়া নারায়ণপুর ত্যাগ করিল। ঢাকায় যাইয়া একখানি চিঠি পাইল—তাহা রাসবিহারী খুড়োর লেখা। চিঠিতে এই কয়েকটি কথা ছিল:—

"বাবা নীলমাণিক, তুমি গত ১৪ই ভাদ্র রবিবার বেলা পাঁচটা তিন মিনিটের সময় আমার ভদ্রাসনবাটীর

উঠানের উত্তরদিকে রান্না-ঘরের নৈঋ'ত কোণে দাঁড়াইয়া তর্জ্জনী অঙ্গুলির লক্ষ্য পশ্চিমদিকে স্থির করিয়া যে আম্রবৃক্ষটি আমার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলে, (যখন তোমার ডানদিকে তোমার খুড়ী ও বামদিকে আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম) সেই আম্রবৃক্ষ সম্বন্ধে তোমার সরল, অপক্ষপাত ও অপরের দ্বারা অপ্রভাবান্বিত উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে আদালতে সাক্ষ্য দিতে হইবে—জানাইয়া রাখিলাম। তুমি সত্যকে আশ্রয় করিয়া এত বড় হইয়াছ, আমার নিশ্চয় বিশ্বাস, তুমি কিছুতেই সত্যের অপলাপ সহ্য করিবে না। অত্র মঙ্গল—পত্রোত্তরে তোমার কুশলসংবাদ জানাইবে।

ইতি ১৩০৫ বাং সন, } আং—
২১শে ভাদ্র। } শ্রীরাসবিহারী অধিকারী।"

পত্রখানি পড়িয়া নীলমাণিকের মুখে প্রথম একটা হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। তার পরেই সে হাসিটুকু নিবিয়া যাইয়া একটা বিষাদের ভাব সুস্পষ্ট হইল।

১৬

এ দিকে রায়পুরে শীঘ্র সংবাদ রটিয়া গেল, নীলমাণিক তথায় আর থাকিবে না। হরিশ গাঙ্গুলীর প্ররোচনায় ব্রাহ্মণ-সমাজ শশিপদ বাবুকে 'একঘরে' করিতে চেষ্টা পাইতেছিল—রাজাবাবু সামাজিক যন্ত্রটির পশ্চাৎ হইতে স্বয়ং এই দলাদলির কল টিপিতেছিলেন। কিন্তু নীলমাণিক দেশত্যাগ করিয়াছে শুনিয়া তাঁহাদের বিদ্বেষ অনেকটা নিবিয়া গিয়াছিল। এ দিকে শশিপদ বাবু নীলমাণিকের অপূর্ব্ব চরিত্র উত্তেজিতভাবে সকলের নিকট কীর্ত্তন করাতে রায়পুরবাসী অধিকাংশ লোক নীলমাণিককে ফিরিয়া পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সে কৃষ্ণ-নামের যে মহাদান ঘরে ঘরে বিলাইয়া গিয়াছে, তাহার উৎস চিরদিনের জন্য বন্ধ হইল বুঝিয়া তাহা যে কতই মহার্ঘ, তাহা সকলে উপলব্ধি করিল। এমন কি,

সেই অন্ধ কুসংস্কারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত সমাজের অনেকে তাহার মেথর পোড়াইবার ব্যাপারটিতেও মহত্ত্ব আবিষ্কার করিল। যাহা কাছে আছে, হাত বাড়াইলেই পাওয়া যায়, তাহার মূল্য কে দেয়? কিন্তু যখন আর পাওয়া যাইবার নয়, তখন জিনিসের প্রকৃত দাম বোঝা যায়। কুসংস্কার, জেদ ও আত্মাভিমান ধর্ম্মের মুখোস পরিয়া যে সকল ভাবের পুষ্টি করে, প্রকৃত ত্যাগশীলতা ও মহত্ত্বের আবির্ভাবে তাহাদের প্রাচীন ভিত ধসিয়া পড়ে। রায়পুরের লোকদের তাহাই হইল। স্বয়ং রাজাবাহাদুর নীলমাণিকের নিকট ক্ষমা চাহিয়া পত্র লিখিলেন, তাহার বাড়ীর উৎসবগুলি এ কয়েক বৎসর যেরূপ জমিয়া যাইত, নীলমাণিকের কীর্ত্তনের অভাবে এবার তাহা হইল না। সকলের মুখে একই কথা—"নীলমাণিকের মুখে হরিনাম সুধাসম; এ পাপ দেশে কেহ আর তাহা শুনিবে না।" নীলমাণিক রাজা বাহাদুরের চিঠির উত্তর দিল। সে কওলা করিয়া

রায়পুরের বাড়ীর স্বত্ব লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের সেবায় দান করিল—ঋণ এই ভাবে শোধ করিয়া সে তাঁহাকে লিখিল—তাহার পক্ষে রায়পুরবাস আর সম্ভব নহে। সে বৃন্দাবন যাইয়া বাকী জীবনটা কাটাইবে, এই তাহার সঙ্কল্প। শশিপদ বাবুকে লিখিল, "আপনি আসুন, রায়পুরের নানা সুখ-দুঃখ-মিশ্র স্মৃতির মধ্যে আপনার স্মৃতিই আমার চক্ষে সমুজ্জ্বল, সংসারের ঝঞ্ঝাট মিটাইয়া আপনি আমার কাছে বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করুন। সেই তীর্থে আপনার মত মহাত্মার পদরেণু পড়িলে আমার নিকট আরও পবিত্র হইবে।" এই চিঠি পাইয়া শশিপদ বাবুর মন যেন দৌড়াইয়া নীলমাণিকের নিকট যাইতে প্রস্তুত হইল। কারণ, সম্প্রতি তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হওয়াতে তিনি অমনই কোন তীর্থে যাইতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন। যে কয়েক মাস যাবৎ নীলমাণিক রায়পুর ত্যাগ করিয়াছে, সে সময়টা তাঁহার নিকট দুঃসহ বোধ হইয়াছে। শীঘ্র শীঘ্র বাড়ীর বন্দোবস্ত

সমাধা করিয়া বৃদ্ধ শশিপদ মুখুয্যে বৃন্দাবনাভিমুখে রওনা হইলেন। সঙ্গে নীলমাণিকের বিপুল অর্থাদিও লইয়া চলিলেন।

১৭

নীলমাণিক বৃন্দাবনে যাইয়া যেন কেমন অধীর হইয়া পড়িল। দ্বাদশ বনের প্রত্যেকটি বন দেখিয়া সে সাশ্রু-নেত্রে কাহার খোঁজ করিত? শ্যামকুণ্ডের পারে যাইয়া শুইয়া থাকিত যে। যে যে স্থান মহাপ্রভুর পদ-রেণু-পূত, সেই সেই স্থানে লুটাইয়া পড়িত। রাধাকুণ্ড, যাবট, গিরি গোবর্দ্ধন—যাহা দেখিত, তাহাতেই তাহার ভক্তির উৎস খুলিয়া যাইত। সে মনে মনে ভাবিত, বহুকাল হইতে বহু লোক, বহু সাধু, বহু অনুতপ্ত ও আর্ত্ত এইখানে আসিয়া কাহাকে খুঁজিয়াছে? তিনি কে? তাঁহাকে কি পাওয়া যায়? তাঁহাকে কি কেহ পাইয়াছে? কৃষ্ণ নামে তাহার চক্ষু সজল হয়, অথচ কৃষ্ণ কে সে

তাহা বুঝিতে পারে না। পাণ্ডারা যখন—"এই স্থানে যশোদা কৃষ্ণকে বাঁধিয়াছিলেন, এখানে তিনি যমলার্জ্জুন ভাঙ্গিয়াছিলেন, এখানে কংসজীর চর বকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, এখানে তিনি ধেনু চরাইয়া সুবল সখার সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন, এই বৃষভানুপুর, এখানে রাধাজীউর পায়ের আলতার চিহ্ন আছে, এই নন্দগ্রাম—ইহার দক্ষিণে যশোদাকুণ্ডের নিকট দধিমন্থনের হাঁড়ি আছে"—এই সকল দৃষ্ট ঘটনার মত বলিয়া যায়, তখন তাহার চোখের জলে গণ্ড ভাসিয়া যায়। কে কবে আসিয়াছিলেন, কিংবা আসেন নাই, ভক্তির নিত্য লীলা-কল্পনায় এই আসা-যাওয়া পরম সত্যের মত হইয়া গিয়াছে—এই পরিচয়ই যথেষ্ট, তাই সেই কথা শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হয়, কে যেন হৃদয়ে আসিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহার চূড়ায় পৃথিবীর সমস্ত বর্ণ-সম্পদ্‌, তাঁহার হাতে জগৎ-ভুলানো বাঁশী। কিন্তু তিনি ছায়ার মতন আসিয়া চলিয়া যান—তাহার

হৃদয়ের ধূলি-পথে এ কাহার আল্‌তা-পরা পদাঙ্ক পড়িয়া আছে ? কাহার পায়ের নূপুরের শব্দ রুণুঝুণু রবে বাজিয়া তাহার কর্ণ জুড়াইয়া দেয় ?

শশিপদ বাবু আসিয়া জুটিলেন—দুই-জনে সর্ব্বদা একসঙ্গে থাকা হয়। নীলমাণিক তাহার সমস্ত সম্পত্তি লোকহিতকর কার্য্যে ব্যয় করিবার জন্ত শশী বাবুর নামে লিখিয়া দিল। সে বলিল, "মহাশয়! সকলেরই নিজ নিজ খেয়াল আছে। দিদিকে অনেক টাকা পাঠাইয়া সদ্ব্যয় করিতে বলিয়াছিলাম।, তিনি পিঁপড়ে ও কাক তাড়াইবার জন্ত পাহারা রাখিয়া তাহার কতকটা খরচ করিয়া ফেলিয়াছেন। এতে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত হই নাই। ভাল-মন্দের বিচার যার যার নিজের কাছে। তিনি যাহা ভাল মনে করিয়াছিলেন, তাহাই করিয়াছিলেন, আমি তাহার অধিক তাঁহার নিকট আর কি প্রত্যাশা করিতে পারি? কিন্তু আপনি যাহা লোকহিতকর, তাহাই করিবেন; আপনার বিবেচনার উপর

আমার অগাধ বিশ্বাস, আপনি দয়া করিয়া এই ভার লইবেন।"

শশী বাবু—"বৃন্দাবনে তোমার মুখে হরিনাম শুনিয়া দেহত্যাগ করিব, এজন্য এসেছিলাম, নিজের সম্পত্তির মায়া কাটাইয়া এসেছি, আবার দেখ্‌ছি, তুমি আমায় কর্ম্মের সূত্রে জড়াইবে।"

শশী বাবু ঘর-গেরস্থালী ছাড়িয়া প্রকৃতই কর্ম্মের অভাবে হাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি ভক্তির কথা শুনিতে ভালবাসিতেন, কিন্তু ভক্তি তাঁহাকে সমস্ত সময় ভুলাইয়া রাখিতে পারিত না। তাঁহার প্রকৃতি নিঃস্বার্থ কর্ম্মের মধ্যেই সফলতা লাভ করিতে চাহিত। তিনি সেই বিপুল অর্থ দ্বারা কিরূপে অন্ধ, আতুর ও নিরন্নদিগের জন্য "অনাথ-সেবা" স্থাপন করিয়াছিলেন,—সেই কর্ম্মের আহ্বানে কিরূপে অকস্মাৎ একদিন প্রাণকৃষ্ণ দাঁ নামক একটি নির্ম্মল, নিরহঙ্কার, সেবা-সর্ব্বস্ব বাঙ্গালী যুবক আসিয়া জুটিয়া তাঁহার দক্ষিণবাহুস্বরূপ হইল, কিরূপে

উভয়ের মিলিত চেষ্টায় শত শত লোকের কষ্ট দূর হইতে লাগিল এবং রাধা-বল্লভ জৈনী নামক এক ব্যক্তি তাঁহার বিপুল অর্থ সমস্তই এই অনাথ-সেবায় দান করিয়া এই মহৎকার্য্যের প্রসার বিশালভাবে বাড়াইয়া দিলেন, যুবকগণ কিরূপে দরিদ্র-নারায়ণের জন্য বিরাট্ মন্দিরে দিনরাত্র খাটিয়া এই নব-পূজায় পূজারী হইল এবং প্রকাণ্ড হর্ম্ম্য-শ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে রাস্তার আসন্নমৃত্যু, উপেক্ষিত নরনারীকে আশ্রয়দান করিয়া বুঝাইয়া দিল— হৃদয়বান্ মনুষ্য-সমাজে মানুষের দুঃখ কখনও উপেক্ষার জিনিস নহে—যাহার পর্ণ কুটির নির্ম্মাণের শক্তি নাই, এমন দরিদ্র ব্যক্তি কিরূপে অন্ধ হইয়া, পঙ্গু হইয়া ভগবৎ প্রসাদে পর্ব্বত-কল্প বিশাল গৃহে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল সেই দীর্ঘকাহিনী এখানে বলিবার কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না।

শশী বাবুর হস্তে সমস্ত সম্পত্তি দান করার পর নীলমাণিক ভ্রমরবৃত্তি আরম্ভ করিল। সেখানে তাহাকে

লইয়া একটা কীর্ত্তনের দলের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই তীর্থস্থলে সে বাঙ্গালী ও ব্রজবাসীদের অনুরোধে কীর্ত্তন না গাহিয়া পারিত না, কিন্তু সেই কীর্ত্তনের উপার্জ্জন দলের লোককেই বিলাইয়া দিত এবং নিজে মাধুকরী করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত। "কৃষ্ণ যদি সত্য হন, তবে তাঁহাকে অবশ্য পাইব," এই বিশ্বাসে সে প্রাণ ধারণ করিয়া রহিল। শশিশেখরের এই পদটি সে সর্ব্বদা গুণ্-গুণ্ করিয়া গাহিত :—

"আমি হরি-লালসে পরাণ তেজব তারে পাওব আন জনমে।"

ইহার মধ্যে একদিন শ্যামসন্ধ্যায় শ্যামল বৃন্দাবনের তরুলতায় সূর্য্যাস্তের লাল আভা পড়িয়া যেন নীলঘোম্‌টার মাঝখানে সিন্দুরচ্ছটার মত দেখাইতেছে। যমুনার জলের রঙে—কালোর উপর সেই লাল রং আসিয়া পড়িয়াছে, যমুনা একখানি লালপেড়ে নীলসাড়ীর মত উড়িয়া চলিয়াছে। মাণিক গুণ্-গুণ্ করিয়া একটি পদ গাহিতে

গাহিতে নদীর ধারে বেড়াইতেছে। রোজ সন্ধ্যাকালে সে একটা শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া যমুনার কালো জল দেখিতে থাকে—সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসে—জলের রঙ আরও কালো হইতে থাকে—এবং প্রকৃতি কালো সাড়ী-পরা রমণীর ন্যায় অস্তগত সূর্য্যের শেষ রেখাটুকু একটি সিন্দুরের টিপের মত পড়িয়া ধীরে ধীরে কোন বিরাট্‌ পুরুষের কোলে লুকাইয়া পড়েন। সেই শিলা-তলে বসিয়া মাণিক রোজই সন্ধ্যা-যমুনার এই মিলনের ছবি দেখিয়া যায়। আজ সে দেখিল, একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক সেই শিলাখণ্ড অধিকার করিয়া আছেন, সুতরাং সেখানে অপেক্ষা না করিয়া সে খানিকটা দূরে চলিয়া গেল। ফিরিয়া আসিবার সময় সে দেখিল সেই বাঙ্গালীর সঙ্গে একটি প্রৌঢ়-বয়স্কাব্রজবাসিনীর কি লইয়া তর্ক হইতেছে। নীলমাণিককে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "মহাশয়, দেখুন দেখি, এই কাগজের টুকরায় যাহার নাম লেখা আছে—আমি সে ব্যক্তি নই, তথাপি এই স্ত্রীলোকটি

বলিয়েছে—এই পাথরের উপর যে বসে আছে, তাহারই নাম এই কাগজে লেখা আছে এবং আমিই সেই লোক।" ব্রজবাসিনী বলিল, "আমার মাইজি মিথ্যাকথা বলিবার লোক নহেন, ইনি পাথরের উপর রোজ ব'সে থাকেন।" প্রবাসী বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি একটু উত্তেজিত-কণ্ঠে বলিলেন—"আমি আজই এই বৃন্দাবনে এসেছি—রাধাকুণ্ডের ধারে আমার বাড়ী। আমি শ্রীরাম পাঠকের নাতি, আমার নাম রাধানাথ পাঠক। কোথাকার নীলমাণিক কে, আমি তাহাকে চিনি না, ঐ নামের একজন প্রসিদ্ধ গায়ক আছে—শুনিয়াছি।"

নীলমাণিক আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, সেই কাগজের টুকরায় তাহারই নাম লেখা আছে। সে ব্রজবাসিনীকে বলিল, "আমারই নাম নীলমাণিক অধিকারী, আমিই রোজ এই পাথরের উপর খানিক সময় ব'সে থাকি। আজ উনি বসেছেন ব'লে আমি চ'লে গেছি, আমাকে তোমার কি দরকার?" ব্রজবাসিনী

তাহাকে একটু দূরে লইয়া বলিল—"মাইজী আপনাকে ডাকিয়াছেন।"

"মাইজী কে?"

"বলিতে পারি না।"

"তুমি কে?"

"দাসী"।

"তিনি কোথায় আছেন?"

"ঐ কুঞ্জে।"

নীলমাণিক দেখিল তরু আচ্ছাদিত একটি ছোট এক তলা বাড়ী। কে, কি জন্য ডেকেছেন? মাইজি কে? যদি সন্তান-হারা জননী হন? যদি আর্ত্তা বা নিঃসহায়া হন? নীলমাণিক অনেক ভাবিয়া স্থির করিল—যাওয়া উচিত। বড় একটা উঠান দিয়া নীলমাণিক গৃহের দরজায় দাঁড়াইল। দাসী ভিতরে যাইয়া ডাকিল 'আসুন'। নীলমাণিক ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, একখানি পরিষ্কার বিছানায় একটি স্ত্রীলোক শুইয়া আছেন—তাঁহার মাথার

অবগুণ্ঠন কেশের প্রান্তভাগ ছুঁইয়া আছে, তিনি মুখ ঢাকেন নাই। তিনি অঙ্গুলী দ্বারা ইসারা করিয়া নীলমাণিককে কাছে ডাকিলেন। নীলমাণিক সম্মুখে যাইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার রক্তের চলাচল বন্ধ হইয়া শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। আজ ১৩ বৎসর পরে সে রাণীকে দেখিল, তাহার মুখের সেই শ্রী এখনও যায় নাই। তাহার সমস্ত সংযম ভাসিয়া গেল, প্লাবনের সময় নদীকুল যেরূপ ভাসিয়া যায়, সেইরূপ ভাসিয়া গেল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল—"রাণী, রাণী, আমার প্রাণের রাণী, আমার হারাণো ধন—আমায় কোন্ দোষে ছাড়িয়া গিয়াছিলে? তুমি আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছিলে, আমার মন তোমার চিন্তা একদিনও ছাড়িতে পারে নাই। আমার সমস্ত গানে—কীর্ত্তনে তুমি আমার হৃদয়-বেদীতে বসিয়া আমার মুখের কথা প্রতিভামন্ত্রে সিদ্ধ করিয়াছ।" রাণীর চোখের কোণে দুই বিন্দু জল গড়াইয়া পড়িল। সে অতি ধীরে বলিল "আমার জীবনান্ত

সময়, নিদারুণ হৃদ্‌রোগে আমার সমস্ত সময়ই শ্বাসরোধ হইয়া যায়। কা'ল ডাক্তার আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন, নাড়ীর গতিটা খারাপ হইয়া গিয়াছে—আমার আয়ু আর দুই তিন দিনের বেশী কিছুতেই যাইবে না। ভাবিয়াছিলাম"—এইবার রাণী কাঁদিয়া ফেলিল, "আর তোমাকে এ কালা মুখ দেখাইব না; কিন্তু তোমার কাছে না কহিয়া পৃথিবী ছাড়িতে কোন মতেই পারিলাম না। ইহার পূর্ব্বেও আমি তোমাকে দুই একবার দেখিয়াছি, তুমি আমাকে দেখ নাই। দুই জনের আবার চোখে চোখে দেখা হইবে, এ লোভ কিছুতেই সংবরণ করিতে পারিলাম না।" বহু কষ্টে রাণী ডা'ন হাতখানা তুলিয়া চোখের জল মুছিল। তাহার মুখখানি শতদলের মত এখনও ঢল-ঢল করিতেছে, কিন্তু নীলমাণিক দেখিল, হাত দুখানি কঙ্কালসার।

রাণী বলিল, "জগার সঙ্গে যখন বাহির হইয়া আসি, তখনই আমার গায়ে জ্বর ছিল,—শেষ রাত্রে রাস্তায়

আসিয়া জ্বর ভয়ঙ্কর বাড়িয়া যায়, পরদিন আমার গায়ে গুটি দেখা দেয়, তদবস্থায় একটা জঙ্গলের মধ্যে আমাকে ফেলিয়া জগা পলায়ন করে। আমি সেই অবস্থায় অজ্ঞান হইয়া দুই দিন পড়িয়া থাকি। শেয়ালগুলা মড়া ভাবিয়া আমায় খাইতে আসে—তার পর কি জানি, আমার গোঁ গোঁ শব্দ শুনিয়া চলিয়া যায়। সেই অজ্ঞান অবস্থায় আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, তুমি আমার জন্য ব্যাকুল হইয়া কাঁদিয়াছ। আমি তোমার পায়ে হাত দিতে যাইয়া হাত সরাইয়া আনিয়াছি, পাছে তোমার পাদপদ্মে কলঙ্কের দাগ পড়ে; কারণ, তখন ধীরে ধীরে আমার কি ভাল, আমার কে প্রিয়, তাহা বুঝিতেছিলাম। এই সময়ে যিনি আমাকে সেবা করিয়া জীবন দিলেন, যিনি আমার পিতার অধিক, তাঁহার কথা আর কি বলিব। তিনি এই কুঞ্জের মালিক কৃষ্ণদাস বাবাজী, সম্প্রতি ৮৮ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছে। তিনি এই কুঞ্জ আমায় দিয়া গিয়াছেন।”

এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতে রাণী হাঁপাইয়া উঠিল, তাহার বাক্‌রোধ হইবার উপক্রম হইল। অবিরল-ধারায় চোখের জল মুছিতে মুছিতে নীলমাণিক তাহাকে বাতাস করিয়া বলিল—"থাক্, এখন না হয় নাই বলিলে, আমি পরে শুনিব।" রাণী কিছু প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার অতি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—"মনের কথা তোমাকে না শুনাইয়া আমি মরিব না। বাবার নিকট অনেক শিখিলাম। ভক্তিযোগের ব্যাখ্যা—ভগবানের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ, কত কথাই তাঁহার মুখে শুনিতাম! যখন শুনিতাম তখন ভাল লাগিত, কিন্তু আমার মন পড়িয়াছিল—তোমার উপর।"

এবার রাণী কাঁদিয়া ফেলিল ;—"আমাকে তুমি এত কাঁদিয়া কাটিয়া প্রেম জানাইতে, আমার জন্য কত কষ্ট সহিতে, সেগুলির মর্ম্ম তখন কিছুই বুঝি নাই। সমস্ত খোয়াইয়া তাহাদের মূল্য বুঝিলাম। যাহা অনায়াসে পাইয়াছিলাম, সেই বহু জন্মের তপস্যার ধনকে ফিরিয়া

পাইবার জন্য মন নিতান্ত ব্যাকুল হইল। আমার প্রাণের ব্যথা কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। বাবাজী আমার মুখের গুটির দাগ ঔষধ দিয়া সারাইয়া ছিলেন, কিন্তু মনের ব্যাথা—মনের দাগ দূর করিবার জন্য যে সকল পরমার্থ-তত্ত্ব দিতেন, তাহাতে সে ব্যথা ঘুচিল না। সেই ব্যথায় হৃদ্‌রোগ জন্মিল। তার পর একদিন বাবাজীর পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া বলিলাম, 'আমি তাঁকে দেখ্‌তে যাব, সংবাদপত্রে জানিয়াছি, তিনি রায়পুর আছেন।' বাবাজী দ্বিরুক্তি করিলেন না, একটি বুদ্ধিমতী ও চতুরা পরিচারিকা দিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিলেন। যে দিন রায়পুর পৌছিলাম,সেদিন পরাণ মুখুয্যের বাড়ী তুমি 'খণ্ডিতা' পালা গান করিতেছিলে। আমি মেয়েদের সঙ্গে মিলিয়া তোমাকে দেখিলাম। আমার পাশের একটি স্ত্রীলোক বলিলেন—'এ কে মেয়ে, ইহার হাঁপানি আছে নাকি? এ এমন ধারা হইয়া যাইতেছে কেন?' আমার মুখ রক্তহীন হইয়া সাদা হইয়া গিয়াছিল

এবং বুকের ওঠা-পড়ার শব্দ পার্শ্ববর্ত্তিনীর কর্ণে সুস্পষ্ট-ভাবে শোনা যাইতেছিল। তুমি গাহিলে—কানু রাধার পায়ে হাত দিয়াছিলেন, মানিনী তখন মানভরে কৃষ্ণের শত অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া মুখ ফিরাইয়াছিলেন। কৃষ্ণ:নিরাশ হইয়া সেই পায়ের দিকে একবার চান—আর একবার চলিয়া যান, 'ঐ পায়ে কি আমার ক্ষমা হইবে না?' এই বলিতে বলিতে চোখ মুছিতে মুছিতে রাধা-কুণ্ডে প্রাণ দিবার জন্য কৃষ্ণ চলিয়া গেলেন। হঠাৎ কৃষ্ণের স্পর্শ পদযুগলে না পাইয়া রাধার মান ভাঙ্গিয়া গেল; তখন উতলা হইয়া বিশাখাকে বলিলেন, 'সখী' তাঁকে না দেখ্‌লে আমার প্রাণ বাঁচ্‌বে না।' এই সময় আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলাম। আর দুইটি মেয়ের সাহায্যে আমায় সুস্থ করিয়া পরিচারিকা পাল্কীতে করিয়া আমাকে আমাদের বাসা-বাটীতে লইয়া আসিল। তার পর সে পরিচারিকা আর আমাকে তোমার কীর্ত্তনে আসিতে দিত না। কিন্তু আর একদিন জোর করিয়া আমি

চাটুয্যেদের বাড়ীতে আসিলাম, সেদিন তুমি 'মাথুর' গাহিতেছিলে, 'আমাকে ছাড়িয়া পিয়া, মথুরায় রহল গিয়া—এও বিধি লিখিলা করমে।' এই গানটি গাহিতে গাহিতে তুমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলে, আমিও তোমাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম, সে দিনও পরিচারিকা পূর্ব্বের দিনের ন্যায় আমাকে শুশ্রূষা পূর্ব্বক বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিল। আমি তোমাকে দেখ্‌বার যোগ্য নই—এই বুঝিয়া পাষাণে বুক বাঁধিয়া বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলাম।

কিন্তু আমার হৃদয়ের কৃষ্ণকে আমি একদিনও একদণ্ডের জন্য ভুলিতে পারি নাই। সেই কোঁকড়ান চুল, সেই মধুর হাস্য আমি দেখিবার জন্য যে ভাবে আরাধনা করিয়াছি—তাহা ভগবান্‌ই জানেন। রোজ রোজ ফুল তুলিতে যাইয়া ফুলের ডালা চোখের জলে সিক্ত করিয়াছি। যমুনার জলে সেই ফুলের ডালা ভাসাইয়া বলিয়াছি—'নদি, তুমি উহা আমার আরাধ্যের পাদপদ্মে

রাখিয়া এস। হায়, আমি তাঁহাকে পাইয়া ছাড়িয়াছি। এমন দুর্ভাগ্যও মানুষের হয়!" আবার রাণীর শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল, তখন দুটি শীর্ণ কর বহুকষ্টে যুক্ত করিয়া রাণী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "বিদায়, আমার মাথার ঠাকুর, প্রণাম, আমার মাথার সিন্দুর মলিন হয় নাই, এই দেখ, হাতের শাঁখা—এ শাঁখা তোমারই আছে, বল, হত-ভাগিনীকে ক্ষমা করিলে? সেই অমৃত-কথা শুনিয়া এই দেহ ত্যাগ করিতে কোন কষ্টই হইবে না। এই বৃন্দাবন মহাতীর্থ, কিন্তু আমার চক্ষে নারায়ণপুরের একটি ধূলির পবিত্রতাও ইহাতে নাই।"

রাণী এই বলিয়া নীরব হইল। যেন বীণা বাজিয়া থামিয়া গেল। যুক্ত কর দু'খানি অবশ হইয়া বুকের উপর পড়িয়া গেল। নীলমাণিক উচ্চকণ্ঠে বলিল—"তোমার কোন পাপ নাই, যদি থাকিত, তাহা আমি শুনিতে চাহিতাম না, সবই মাপ করিতাম! দোহাই

তোমার, এতকাল পরে দেখা দিয়া আমায় ছেড় না।" কিন্তু সেই স্নেহ-ভিখারীর আকুলকণ্ঠ—বুক-ফাটা শ্বাস রাণী শুনিল কি না, জানি না। যখন নীলমাণিক ক্ষণকালের জন্য দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সংজ্ঞাহীনের মত থাকিয়া পুনরায় পিপাসুনেত্রে রাণীর মুখের দিকে চাহিল, তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে। রাণীর ওষ্ঠাধরে একটু মৃদুহাস্য খেলিতেছিল, তাহা যেন কৌতুক করিয়া বলিতেছিল—'এ যাত্রা ফাঁকি দিলাম'—এবং চক্ষু দুটি নীলমাণিকের পায়ের দিকে ন্যস্ত হইয়া চিরস্থির হইয়া গিয়াছে!

১৮

যমুনার তীরে দাঁড়াইয়া নীলমাণিক ভাবিতেছে—'আমার কে আছে?' সমস্ত প্রকৃতি যেন সাড়া দিয়া বলিল—'আমরা আছি।' যমুনার কালো জল উছলিয়া উঠিয়া বলিল—'আমি আছি।' সমস্ত মনুষ্যজাতির অন্ত-

রক্ততার সুর সে হৃদয় মধ্যে শুনিতে পাইল ; তাহারা যেন বলিতে লাগিল—'আমরা আছি।'

কিন্তু যাঁহাকে পাইলে সকলকে পাওয়া যায়, তিনি কোথায় ? তাঁহাকে না পাইয়া অপর সকলকে পাইলে সে পাওয়া স্থায়ী হইবে না। তাঁহাকে পাওয়া চাই-ই। আমি তাঁহাকে এই দুটি চক্ষু দিয়া দেখিব। সকলকে তিনি দেখাইয়া নিজেকে লুকাইলেন। এই ইন্দ্রজাল ব্যর্থ। তাঁর বাক্য আমি কর্ণে শুন্‌তে চাই। কোথায় তিনি, কে দেখাইবে ? আর্ত্ত হইয়া—রাণীর শোকে উন্মত্ত হইয়া, নীলমাণিক তাহার আরাধ্যকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইল। গানে মত্ত হইয়া তাহার কখনও মনে হইয়াছে—তাঁহার পীতবাসের আভা তাহার চক্ষের সামনে পড়িয়াছে—আবার তখনই তাহা সরিয়া গিয়াছে। কখনও কি কহিয়া, আধখানি না কহিয়া কে যেন চলিয়া গেলেন। তাঁহার চরণরাগে তাহার হৃদয়-প্রাঙ্গণ রাঙ্গিয়া উঠিল।

নীলমাণিক দুই চোখের অশ্রু সামলাইতে পারিতেছে না; রাণীর মুখে আগুন দিতে যাইয়া সে ডান হাতখানি পোড়াইয়া আসিয়াছে, কিন্তু সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই; কেবলই বলিতেছে—'তাঁহাকে দেখিব।'

সহসা কে যেন ডাকিয়া বলিল—'দেখ্‌বে যদি দেখা দিব, প্রতীক্ষা করিয়া থাক।' এই বাণীর সঙ্গে যেন দিগ্‌দিগন্ত সুগন্ধে ভরিয়া আসিল—কাহার জ্যোতির আভা আসিয়া কালো যমুনার জলকে সিন্দূরবর্ণে উজ্জ্বল করিয়া গেল।

সত্যই দেখা হবে—বিশ্বাসে নীলমাণিকের চক্ষে বিন্দু বিন্দু জল পড়িতে লাগিল। জনম—মরণের কর্ত্তা, চির সখার সঙ্গে সত্যই দেখা হইবে—এই বিশ্বাসে প্রাণ ভরিয়া গেল। যাহাকে দেখি নাই, শুনি নাই,—অথচ কতবার সংসার-পীড়নে কাঁদিয়া অনির্দ্দিষ্টভাবে তাঁহার শরণ লইয়াছি; যাঁহার পদতলে মাথা রাখিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিবার জন্য কতবার মন্দিরে মন্দিরে ঘুরিয়াছি—

আজ কে বলিয়া গেলেন,—তিনি আসিবেন। সেই সান্ধ্য-গগন প্লাবিত করিয়া নীলমাণিক চণ্ডীদাসের এই পদটি পাগলের মত গাহিতে লাগিল,—

"সখি, আজি সুদিন কুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে, আওব তুরিতে, কপাল কহিয়ে গেল।
চিকুর ফুরিছে, বসন খসিছে, পুলক যৌবন-ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি, সঘনে নাচিছে, দুলিছে হিয়ার হার ॥
প্রভাত-সময়ে, কাক কোলাহলি, আহার বাটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার, নাম সুধাইতে, উড়িয়া বসিল তায় ॥
মুখের তাম্বুল, খসিয়া পড়িছে, দেবের মাথার ফুল।
চণ্ডীদাস কহে, মাধব আওব, সব ভেল অনুকুল।"

এই গানটি কম্পিত-কণ্ঠে গাহিতে গাহিতে নীলমাণিক গৃহে ফিরিয়া আসিল। দরজার কাছে আসিয়া দেখিল, তাহার শৈশবের গুরু গোবর্দ্ধন সাহা গৃহের রকে বসিয়া হুঁকা হাতে তামাক খাইতেছেন।

নীলমাণিককে দেখিয়া গুরু বলিলেন—"বাবা, তোমার চেহারা এ কয়েক মাসের মধ্যে একেবারে বদলাইয়া গেছে!" গোবর্দ্ধন জানিতেন না—ইহা কয়েক মাসের মধ্যে নহে—কয়েক দিনে। "বড় রোগা হয়ে গেছ। শুন্‌লাম, তুমি সংসার ছাড়িয়া একবারে সাধু হইয়া গেছ—তা ভাল, তোমাকে একটা জিনিস দেব ব'লে এসেছি। আমার ছেলে রতন এখন সংসারের ভার নিয়াছে—আমরা স্বামি-স্ত্রী বৃন্দাবনে বাস কর্‌ব ব'লে চ'লে এসেছি।"

"কি জিনিস দিবেন?" বলিয়া নীলমাণিক গুরুর পায়ের কাছে ঘেঁষিয়া বসিল।

"তোমার হাতেই সে জিনিস মানাবে ভাল," এই বলিয়া গোবর্দ্ধন একটা বড় কাপড়ের ব্যাগ হইতে একখানি ছোট বাসুদেব-মূর্ত্তি বাহির করিয়া বলিল,—"সাভারে আমার মামা-বাড়ী, আমার মামা গোপাল চৌধুরী, তুমি তাঁকে ছোটবেলা কতবার দেখেছ, সেই যে

আমাদের পাঠশালায় আসিয়া বড় মোড়াটা চাপিয়া বসিয়া তোমাদিগকে তামাক সাজিতে বলিত। হ্যাঁ গো, তোমার মনে পড়েছে, তাঁহার ছেলে-পিলে নাই, আমিই তাঁহার বাড়ী-ঘরদোর পেয়েছি। তাঁরই বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে একটা পাথরের ভাঙ্গা মন্দির মাটীর নীচে ছিল,—জনেরা সেইখানে জঙ্গল কাটিতে কাটিতে পাথরে কুড়ুল পড়ে,—সেই মন্দির বাহির হয়ে পড়ে, কলেক্টর সাহেব নিজে আসিয়া তার একটা পাথর নিয়ে গেছেন, তার মধ্যে লেখা ছিল—'হরিশ পাল ঐ মন্দির স্থাপন করেন,' লেখাটা কিন্তু বাঙ্গালার মত নয়। আমি জীবনভর, তোমাদের পড়িয়েছি বাবা, 'ক খ' শাস্ত্র ত আমার অবিদিত নাই, কিন্তু 'হরিশ পাল' নামটা যা ওঁরা পড়লেন, তা গায়ের জোরে। যা হোক্, সেই মন্দিরে আমি এই বাসুদেব-মূর্ত্তিটি পাইয়াছি,—কালেকটর সাহেবের লোকেরা এটি দেখ্‌তে পায় নাই, আমি লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, নতুবা লইয়া যাইত। বড় সুন্দর

মূর্ত্তি, ভাবলুম, তোমার মত কৃষ্ণভক্ত আর কে আছে? তোমাকেই দেব।" ইহার পরে আরও খানিকটা গল্প জুড়িয়া দিয়া—কল্কের সমস্তটুকু তামাক পোড়াইয়া, "আমরা রাধা-সাহার কুঞ্জে থাকে—ঐ শ্যাম-কুণ্ডের উত্তরে, মাঝে মাঝে দেখা ক'র" বলিয়া বৃদ্ধ চলিয়া গেল।

নীলমাণিক ভাবিল,—"আমি কাহার কথা স্বপ্নে শুনিতেছিলাম, তিনি কি এই পাথর? তাহাই যদি হয়, তবে অভ্যর্থনার ত্রুটি হইবে না।"

সে মূর্ত্তিখানি ভাল করিয়া দেখিল না। শিশু যেমন ভাল কুলটি গাছের তলায় কুড়াইয়া পাইয়া নিভৃতে সব শেষে খাইবার জন্য তুলিয়া রাখে, সেও সেইরূপ মধ্যরাত্রে নির্জ্জন কক্ষে তাহা ভাল করিয়া দেখিবার জন্য রাখিয়া দিল। সময় আর ফুরায় না। তাহাকে দেখিতে—তাহার মুখে হরিনাম শুনিতে কেবলই লোক আসিতেছে, সেই ভিড় ঠেলিয়া সময় আর কাটে

না। যাহা হউক, মধ্যরাত্রে সকলে চলিয়া গেল। নীলমাণিক রাণীর মৃত্যুর পর এই দুই দিন কিছু খায় নাই। সে উপবাসী থাকিয়া ভক্তির অর্ঘ্য সাজাইয়াছে, সে নিশ্চিত কিছু পাইবে, এই বিশ্বাসে পুলকিত হইয়াছে; হউক না কেন তাহা পাষাণ। তাঁহার ইচ্ছায় হরিদ্বারে পাষাণ ভেদ করিয়া গঙ্গোদক বাহির হইয়াছে। পাষাণ-স্তম্ভ হইতে তিনি একবার বাহির হইয়া ভক্তের বিশ্বাসকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছিলেন, এরূপ—পুরাণে লেখা আছে।

মধ্য রাত্রে মোমবাতি হাতে সে পূজার কক্ষের দ্বার খুলিল। পাথরের মূর্ত্তির দিকে সে সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করিল—কষ্টিপাথরের দুই দিব্যাঙ্গনা সহচরী, ইঁহারা বুঝি লক্ষ্মী ও সরস্বতী—তাঁহাদের অঙ্গ-ভঙ্গী ও চারুকুন্তল শিল্পীর কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছে। পায়ের নূপুর আঙ্গুল-গুলির পার্শ্বে সুবক্র হইয়া আছে, এই দুই মূর্ত্তির মধ্যস্থলে কি সুন্দর বিগ্রহ! নাকটি তিলফুলের ন্যায়, কপাল

দর্পণোপম—মাথার মুকুটে কত শিল্পলীলা। বাহুতে অঙ্গদ-বলয় ; কটিতট হইতে পীতাম্বর ঝুলিয়া পড়িয়াছে—চারি হস্তে, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম। কর্ণদ্বয়ের নীচে—গ্রীবার উভয় পার্শ্বে দুটি ছিদ্র, বোধ হয়, কোন রাজ-মন্দিরে এই দুই ছিদ্রপথে পুরোহিত গলায় হীরার হার পরাইতেন। মুকুটের পার্শ্বেও সেইরূপ দুই দিকে দুই ছিদ্র—মুকুটকে মণিমাণিক্যে খচিত করিবার জন্য। কত কোটি ভক্তের প্রণম্য দুটি পাদপদ্ম কঠিন পাথরেও যেন কোমল হইয়া আছে। এই মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া কত পিতা-মাতার অশ্রু, আবেদন ও নিবেদন উৎসর্গ পাইয়াছেন, কত সাধুর স্তব শুনিয়াছেন, নৃত্য-গীতবাদ্য-মুখরিত, কত উৎসব ইঁহারই উপলক্ষে হইয়াছে, ইঁহার ভোগের জন্য নিত্য নিত্য কত বিরাট্ কাণ্ডই না হইয়াছে। কত উদ্যানের পুষ্প উজাড় হইয়া ইঁহার অঙ্গরাগ হইয়াছে এবং পাদপদ্মে নিবেদিত হইয়াছে ; কত মালী রাত্রি জাগিয়া ইঁহার জন্য মালা নির্ম্মাণ করিয়াছে ; কত শঙ্খ, ঘণ্টা ও কাঁসরের

তখন ইঁহার আরতি হইয়াছে—তখন উচ্চ নহবৎ বাজিয়া কত শত লোককে সেই আরতি দেখিতে আমন্ত্রণ করিয়াছে; কত রাজ-রাজেশ্বর হীরার মুকুট খসাইয়া রাখিয়া নগ্ন-শির ও নগ্ন-পদে ইঁহার শ্রীপাদপদ্মে নমস্কার জানাইয়াছেন।

কিন্তু ইঁহার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? ইনি ত পাষাণ ভিন্ন কিছু নহেন।

নীলমাণিকের দৃষ্টি সহসা বাসুদেবের অধরের দিকে পড়িল, সে মোমবাতিটি কাছে আনিয়া দেখিল, সেই অধরে একটা হাসি লগ্ন রহিয়াছে—তাহা যোগীর ধ্যানে পাওয়া, যূথিকা-প্রসূনের মত নির্মল—অপগণ্ড মাতৃ-স্তন্যপায়ী শিশুর স্বপ্নের হাসির ন্যায় অপার্থিব। উহা অনাবিল আনন্দের স্বরূপ। ফুলটি শুকাইয়া মরিলেও তাহা হইতে সেই হাসিটুকু ফুরায় না, ইহা তাহাই। ইহা জড়-জগৎকে অতিক্রম করিয়া—তুচ্ছ করিয়া নিজের গৌরবমণ্ডিত অস্তিত্ব অটুট রাখে। সে হাসি দেখিতে

দেখিতে নীলমাণিক তন্ময় হইয়া গেল, ক্রমে ক্রমে দুইটি মোমবাতি জ্বলিয়া গেল। প্রথম রাত্রে বর তাহার প্রেয়সীর মুখ দেখিয়া যেরূপ সারারাত্রি এক মিনিটের মধ্যে কাটাইয়া দেয়—সেইরূপ অবিদিত-গতযামা রজনী কেমন করিয়া চলিয়া গেল, নীলমাণিক তাহা বুঝিল না। একবার যেন মনে হইল, তাহার রাণী কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহাকে যে প্রেম জানাইয়াছিল, সে ফাঁকি দিয়া যাইবার সময় যে নিরাবিল সুন্দর হাসিতে মৃত্যুর দুঃখকে উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছে, বাসুদেবের এই আধ-কুঞ্চিত অধরে সেই হাসিটুকু—সেই প্রেমের গৌরবটুকু রাখিয়া গিয়াছে; আবার ভাবে, তাহার জননী তাহাকে বস্ত্রাঞ্চলের পার্শ্বে পাইয়া যে স্নেহ-আদর-পূর্ণ হাসি হাসিতেন—এ সেই হাসি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু সুন্দর, সেই হাসির রেখায় তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রাতে নীলমাণিক পূজার কক্ষ ছাড়িয়া গেল: কিন্তু সারাদিন যে কথা কহে বা কাজ করে, তাহার সকলের ভিতর সেই হাসিটুকু তাহাকে কি

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

য়ুরোপ প্রভৃতি মহাদেশে ছয়-"পেনি-সংস্করণ"—"সাত-পেনি-সংস্করণ" প্রভৃতি নানাবিধ সুলভ অথচ সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হয়—কিন্তু সে সকল পূর্ব্বপ্রকাশিত অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের পুস্তকাবলীর অন্যতম সংস্করণ মাত্র। বাঙ্গলাদেশে—পাঠকসংখ্যা বাড়িয়াছে, আর বাঙ্গালাদেশের লোক—ভাল জিনিষের কদর বুঝিতে শিখিয়াছে; সেই বিশ্বাসের একান্ত বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা বাঙ্গালা দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কীর্ত্তিকুশল গ্রন্থকারবর্গ-রচিত সারবা[ন] সুখপাঠ্য, অথচ অপূর্ব্ব-প্রকাশিত পুস্তকগুলি এইরূপ সুলভ সংস্করণে প্রকাশি[ত] করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমাদের চেষ্টা যে সফল হইয়াছে, 'অভাগী' ও 'পল্লী-সমাজের' এই সামান্য কয়েক মাসের মধ্যে চতুর্থ সংস্করণ এবং ধর্ম্মপাল বড়বাড়ী, কাঞ্চনমালা, দুর্ব্বাদল ও অরক্ষণীয়ার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিবা[র] প্রয়োজন হওয়াই তাহার প্রমাণ।

বাঙ্গলাদেশে—শুধু বাঙ্গলা কেন—সমগ্র ভারতবর্ষে এরূপ সুল[ভ] সুন্দর সংস্করণের আমরাই সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তক। আমরা অনুরোধ করিতে[ছি] প্রবাসী বাঙ্গালী মাত্রেই আট-আনা-সংস্করণের গ্রন্থমালার প্রকাশিত গ্রন্থগু[লি] একত্রে গ্রহণ করিয়া অপ্রকাশিত গুলির জন্য নাম রেজেষ্ট্রী দ্বারা গ্রাহকশ্রে[ণী] ভুক্ত হইয়া এই 'সিরিজের' স্থায়িত্ব সম্পাদন ও আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করুন।

কাহাকেও অগ্রিম মূল্য দিতে হইবে না; প্রতি বাংলা মাসে নূ[তন] পুস্তক বাহির হইলেই, সেইখানি ভি, পি ডাকে প্রেরণ করিব। পুনঃ পু[নঃ] পত্র লিখিতে হইবে না।

অভাগী (৪র্থ সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন

ধর্ম্মপাল (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্, এ

পল্লী-সমাজ (৪র্থ সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কাঞ্চনমালা (২য় সংস্করণ)—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্, এ

বিবাহ-বিপ্লব (২য় সংস্করণ)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্, এ

চন্দ্রনাথ (২য় সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দুর্ব্বাদল (২য় সংস্করণ)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত

বড়বাড়ী (২য় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন

অরক্ষণীয়া (২য় সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ময়ূখ—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ

সত্য ও মিথ্যা—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

রূপের বালাই—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়

সোণার পদ্ম—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ

লাইকা—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী

আলেয়া—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

বেগম সমরু—(সচিত্র) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নকল পাঞ্জাবী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত

বিল্বদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত

হালদার বাড়ী—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

মধুপর্ক—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

লীলারস্বপ্ন—শ্রীমনোমোহন রায়, বি. এ. বি এল্

সুখের ঘর—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত, এম্, এ

মধুমল্লী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

রসির ডায়ারী—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী

ফুলের তোড়া—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ

সীমন্তিনী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু

নব্য-বিজ্ঞান—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্, এ

নব-বর্ষের-স্বপ্ন—শ্রীসরলা দেবী

নীলমাণিক—রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি, এ

হিসাব-নিকাশ—(যন্ত্রস্থ) শ্রীকেশব চন্দ্র গুপ্ত, এম, এ, বি, এল

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা